নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপরঃ

পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

নিমতলী, চুড়িহাট্টা এবং অতঃপর: পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক - গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)*

গবেষণা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মো. মোস্তফা কামাল, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*
আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

গবেষণা সহকারী
ইসরাত জাহান সাথী
শাহানা ইসলাম

পরিমার্জনা
শাহাজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি*

৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৯১২৪৯১৫
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

ঢাকা মহানগরীতে অগ্নিকাণ্ড একটি ঘন ঘন সংঘটিত ভয়াবহ দুর্যোগ। মহানগরীর বর্তমান ৪৯টি থানার মধ্যে পুরনো ঢাকায় অবস্থিত আটটি থানার আওতাধীন এলাকাগুলোতে এ প্রবণতা আরও ভয়াবহ। পুরনো ঢাকায় সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া ভয়াবহতম অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড অন্যতম। ২০১০ সালের ৩ জুন রাতে নিমতলীর অগ্নিকাণ্ডে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১২৪ জন মৃত্যুবরণ করেন ও কয়েকশ মানুষ আহত হন। নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের প্রায় নয় বছর পর ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে চকবাজারের চুড়িহাট্টার আগুনে আবারও অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৭০ জন মৃত্যুবরণ করেন ও কয়েকশ মানুষ আহত হন। উভয় ঘটনার ভয়াবহতার পেছনে অননুমোদিত রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম বা কারখানার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। বিপুল জনসংখ্যার এই মহানগরীর প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ মানুষের বসবাস পুরনো ঢাকায় হওয়ার কারণে এখানে ঝুঁকি অনেক বেশি।

নিমতলী ট্রাজেডির পর প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় যা ১৭ দফা সুপারিশ পেশ করে। এর পাশাপাশি মহামান্য হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ ও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করেন। তবে নিমতলী ট্র্যাজেডির পর প্রায় নয় বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও পুরনো ঢাকার অগ্নিনির্বাপণ ঝুঁকি নিরসণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি না ঘটার ফলে পুনরায় চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের মতো আরেকটি ট্র্যাজিক ঘটনার সৃষ্টি হয়।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত, প্রতিষ্ঠান ও বিষয় নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অংশীজনদের দায়িত্ব, সক্ষমতা এবং চর্চায় সুশাসনের ঘাটতিগুলো কী কী, প্রায় দশ বছর পরেও তদন্ত কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্সের সুপারিশ এবং উচ্চ আদালতের আদেশ কেন কার্যকর হচ্ছে না তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট গবেষণার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে বর্তমান গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো নির্দেশকের ক্ষেত্রেই সুশাসনের ঘাটতি ছিল, যার কারণে পুরনো ঢাকায় নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রতিপালন না করার পাশাপাশি আদালতের অবমাননাও করেছে। পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস এখনও পর্যন্ত রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির কারণে বাস্তবের মুখ দেখতে ব্যর্থ। কতিপয় প্রভাবশালীর অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। দ্রুত অগ্নি নির্বাপণের জন্য পুরনো ঢাকায় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয় নি। এছাড়া অগ্নি-দুর্ঘটনাকে দুর্যোগ হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি - অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় বাজেট ও পরিকল্পনাও নেই। একই প্রবণতার কারণে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকেও যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত তৈরি করা হয় নি, এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার প্রবণতাও রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ের অভাবে অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধে উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি ও দীর্ঘসূত্রতা বিদ্যমান যার ফলে সময় ও অর্থের অপচয় হচ্ছে। সার্বিকভাবে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অংশগ্রহণ ও সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ না থাকলে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

প্রধান অংশীজন হিসেবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, গবেষক ও বিশেষজ্ঞ যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়া পুরনো ঢাকার অগ্নি ঝুঁকিপ্রবণ বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার স্থানীয় বাসিন্দা, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া, দোকান মালিক ও কর্মচারী, মার্কেট মালিক ও সমিতির নেতা, রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম মালিক, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ যারা তাদের অভিজ্ঞতানির্ভর তথ্য প্রদান করে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবি'র গবেষক মো. মোস্তফা কামাল ও প্রাক্তন সহকর্মী আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া। টিআইবি'র উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল হাসান এই গবেষণা কার্যক্রমের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া প্রতিবেদনটি তদারকি, সম্পাদনা ও পরিমার্জনের ক্ষেত্রে গবেষণা ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার শাহাজাদা এম আকরামের বিশেষ সহযোগিতা এবং উপস্থাপনার ওপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানের জন্য বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই গবেষণার ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তায় সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এ গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

মুখবন্ধ .... উৎৎড়ৎ! ইড়ড়শসধৎশ হড়ঃ ফবভরহবফ.

সূচিপত্র ৫

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ৬

১.১ প্রেক্ষাপট ৬

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা ৯

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি ৯

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা ১০

১.৫ প্রতিবেদন কাঠামো ১০

দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি ১১

২.১ গবেষণা এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন ১১

২.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ১১

২.৩ বিশ্লেষণ কাঠামো ১২

২.৪ গবেষণার সময়সীমা ১৩

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল ১৪

৩.১ পুরনো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ১৪

৩.২ পুরনো ঢাকার অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ১৫৪

৩.২.১ সক্ষমতা ১৭৪

৩.২.২ সমন্বয় ২৪২

৩.২.৩ স্বচ্ছতা ২৮৭

৩.২.৪ জবাবদিহিতা ৩০৯

৩.২.৫ অংশগ্রহণ ৩১

৩.২.৬ অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩১

চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার ৩৫

৪.১ উপসংহার ৩৫

৪.২ সুপারিশ ৩৬

সহায়ক তথ্যসূত্র ৩৮

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

অগ্নিকাণ্ড আইন অনুযায়ি দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করা হয়।[১] ঢাকা মহানগরীতে অগ্নিকাণ্ড একটি ভয়াবহ দুর্যোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিগত ২০১৪, ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে ঢাকা মহানগরীতে ছোট-বড় মিলিয়ে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যথাক্রমে ২৩৯৭ টি, ১৯৭৭ টি এবং ২৯৫৩টি।[২] ঢাকা মহানগরীর ৪৯টি থানার মধ্যে পুরনো ঢাকায় অবস্থিত ৮টি থানার আওতাধীন এলাকাসমূহে এ প্রবণতা আরও ভয়াবহ। বিভিন্ন গণমাধ্যমে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরেকে উদ্ধৃত করে বলা হয় যে ২০১৮ সালে পুরনো ঢাকার লালবাগ, হাজারীবাগ, সদরঘাট ও সিদ্দিকবাজার এলাকায় অন্তত ৪৬৮টি অগ্নিকাণ্ড ঘটে; এবং বর্তমানে পুরনো ঢাকায় দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের প্রায় ১৫,০০০ হাজার গুদামের উপস্থিতি রয়েছে।[৩] পুরনো ঢাকার সাম্প্রতিক কালের ঘটে যাওয়া ভয়াবহতম অগ্নিকাণ্ডসমূহের মধ্যে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড ছিল অন্যতম। উভয় ঘটনার ভয়াবহতার পেছনে অননুমোদিত রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম বা কারখানার উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। ২০১০ সালের ৩ জুন রাতে নিমতলীর ৪৩ নবাব কাটরার নিচতলায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার থেকে সূত্রপাত হওয়া আগুন রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদামে ছড়িয়ে পড়লে অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১২৪ জনের মৃত্যু ও কয়েকশ মানুষ দগ্ধ হন। ভবনসংলগ্ন একটি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরিত হলে সেখান থেকে আশেপাশের ভবনগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।[৪] ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের মতে, ভবনের আশেপাশের দোকানগুলোতে থাকা রাসায়নিক পদার্থ ও দাহ্য পদার্থের সংস্পর্শে আগুন দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এছাড়া আক্রান্ত এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ হওয়ায় অগ্নিনির্বাপক কর্মীদের সে এলাকায় যেতে ও কাজ করতে বাধার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে দ্রুত অগ্নিনির্বাপণ কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্ত হয়ে। এছাড়া পুরনো ঢাকা এলাকার সংকীর্ণ রাস্তা দিয়ে তাদের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও অগ্নিনির্বাপক বাহন প্রবেশ করাতেও যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়।[৫]

নিমতলী অগ্নিকাণ্ড ৩ জুন ২০১০ (ছবি: একুশে টেলিভিশন, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

পুড়ে যাওয়া ওয়াহিদ ম্যানসন (ছবি: বিবিসি বাংলা, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯)

[১] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২, ধারা ২(১১)(আ)

[২] "Fire Hazards in Dhaka City: An Exploratory Study on Mitigation Measures"; Md. Zahirul Islam, Professor Dr. Khondokar Mokaddem Hossain; http://www.iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/Vol12-%20Issue%205/Version-1/G1205014656.pdf

২ *Dhaka Tribune (ইংরেজি ভাষায়) ২৮ মার্চ ২০১৯*

[৪] *রয়টাস (ইংরেজি ভাষায়)। ৩ জুন ২০১০*

[৫] *AFP (ইংরেজি ভাষায়)। ৩ জুন ২০১০*

নিমতলী ট্রাজেডির পর বরাবরের মতো একটি তদন্ত কমিটি গঠন গঠন করা হয় যা প্রধানন্ত্রীর নির্দেশে করা হয় এবং এই কমিটি কর্তৃক ১৭ দফা সুপারিশ পেশ করা হয়। এছাড়া ৫ জুন ২০১০ সারা দেশে রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা হয়। এর পাশাপাশি মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক ঢাকা সিটি কর্পোরেশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারসহ বিবাদীদের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানো নোটিশ ও একটি আদেশ জারি।

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের প্রায় নয় বছর পর ২০১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে চকবাজারের চুড়িহাট্টার ওয়াহিদ ম্যানশনের রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদামের আগুনে আবারও অগ্নিদগ্ধ হয়ে ৭০ জনের মৃত্যু ও কয়েকশ মানুষ দগ্ধ হন। তবে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০ ফেব্রুয়ারি রাত ১০টা ৩৮ মিনিটে রাজধানীর পুরনো ঢাকার চকবাজার থানার চুড়িহাট্টা মসজিদ সংলগ্ন আসগর লেন, নবকুমার দত্ত রোড ও হায়দার বক্স লেনের মিলনস্থলে একটি প্রাইভেট কারের সিলিন্ডার বিস্ফোরণের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। সেই আগুনে প্রাইভেট কারের কাছেই থাকা গ্যাস সিলিন্ডারবাহী একটি পিকআপের সিলিন্ডারসমূহও বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরিত হয় পার্শ্ববর্তী খাবার হোটেলের গ্যাস সিলিন্ডার এবং রাস্তার বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটারও। পুরো এলাকা বিদ্যুৎ-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে নিকটস্থ রাজ্জাক ভবন, হাজী ওয়্যাহিদ ম্যানশনসহ পাঁচটি ভবনে। হাজী ওয়াহেদ ম্যানশনে থাকা পারফিউমের গুদাম ও অন্যান্য দোকানে রাখা প্লাস্টিক তৈরির উপাদানসমূহ দাহ্য পদার্থ হিসেবে আগুন ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে।[৬][৭][৮] আরেকটি ব্যাখ্যা অনুসারে, মোড়ে থাকা একটি বিদ্যুতের ট্রান্সফরমার থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।[৯] পরবর্তীতে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের করা তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ওয়াহেদ ম্যানশনের দ্বিতীয় তলায় রাখা সুগন্ধির ক্যানগুলো থেকে কোনো কারণে বাতাসে বিস্ফোরক মিশ্রণ তৈরি হয়েছিল। বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গ ওই মিশ্রণের সংস্পর্শে এসে বিস্ফোরণ ঘটে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। প্রতিবেদনটিতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুনের সূত্রপাত হওয়ারার বিপক্ষে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে।[১০] অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের ঘটনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শোক প্রকাশ করেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্ধার কার্যের তত্ত্বাবধান করেন বলে জানান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র।[১১] ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ সোমবার এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন করা

নিমতলী ট্রাজেডির পর তদন্ত কমিটি প্রদত্ত সুপারিশসমূহ

- জরুরী ভিত্তিতে আবাসিক এলাকা থেকে গুদাম বা কারখানা সরিয়ে নেয়া
- অনুমোদনহীন কারখানার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া
- অগ্নিপ্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন-২০০৩ ও ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড অনুযায়ি ভবন নির্মাণ নিশ্চিত করা
- রাসায়নিক দ্রব্যের মজুদ, বাজারজাতকরণ এবং বিক্রির লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে তদারকি প্রক্রিয়া বাড়ানো
- আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক বা বিস্ফোরক দ্রব্যের মজুদ বা বিপণনের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা
- দ্রুত অগ্নিনির্বাপণের জন্য স্থানীয়ভাবে পৃথক পানির লাইনসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন
- আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক বা বিস্ফোরক জাতীয় পদার্থ মজুদ বা বিপণন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা
- বাড়িঘরে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক তারের গুণগত মান নিশ্চিত করা
- রাস্তায় স্থাপিত খোলা তারের ব্যাপারে সাবধানতা
- সম্ভাব্য দুর্ঘটনা পরিহার করতে মাসে অন্তত একবার ট্রান্সফরমার সরেজমিনে পরীক্ষা করা
- দুর্ঘটনা মোকাবেলায় জাতীয় পর্যায়ে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সমন্বয়ে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন
- রাসায়নিক ও রাসায়নিক জাতীয় দাহ্য বস্তুর সব দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়
- সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বিভাগে অবকাঠামো, জনবল, প্রশিক্ষণ ও সাজ-সরঞ্জামের আধুনিকায়ন, সচেতনতা বাড়ানো
- অগ্নিকান্ডের সময় যেন উৎসুক জনতা উদ্ধারকাজে বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, সেজন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বাড়ানো
- পাঠ্যসূচিতে অগ্নিকান্ড, উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয় বাধ্যতামূলক করা
- ৬২,০০০ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা
- বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ডেকরেটরের উপকরণের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা

---

[৬] "কেমিক্যালের কারণে নয়, অগ্নিকাণ্ড গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে"। *প্রথম আলো ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯*

[৭] "চকবাজার অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের তদন্ত: যেভাবে আগুন লেগেছে পুরনো ঢাকার এই ব্যবসা কেন্দ্রে"। *বিবিসি ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯*

[৮] "যে গাড়ি থেকে চকবাজার মৃত্যুপুরী"। *যুগান্তর ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯*

[৯] "কীভাবে আগুনের সূত্রপাত?"। *প্রথম আলো ২০১৯-০২-২২*

[১০] "দোতলা থেকেই আগুনের শুরু"। *প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৯*

[১১] "[illegible] [illegible]: [illegible] [illegible] প্রধানমন্ত্রী"। *যুগান্তর। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯*

হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ অনুযায়ী আপদ (Hazard) বলতে কারিগরি ত্রুটির কারণে বা মানুষ দ্বারা সৃষ্ট বিপর্যয় সংঘটনের মাধ্যমে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপদ ও হুমকির মধ্যে নিপতিত করে এবং জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহের ভয়াবহ ও অপূরণীয় ক্ষতিসহ দুঃখ দুর্দশার সৃষ্টি করে এমন উপাদান বা ঘটনাকে বোঝানো হয়েছে। একই আইনে দুর্যোগ (Disaster) বলতে মনুষ্যসৃষ্ট কারণে সৃষ্ট যে কোন ঘটনা, যাহার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সম্পদ, সম্পত্তি ও পরিবেশের এইরূপ ক্ষতিসাধন করে অথবা এইরূপ মাত্রায় ভোগান্তির সৃষ্টি করে, যাহা মোকাবেলায় ঐ জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ, সামর্থ্য ও সক্ষমতা যথেষ্ট নয় এবং যাহা মোকাবেলার জন্য বাহিরের যে কোন প্রকারের সহায়তা প্রয়োজন হয়; এই দুই সংজ্ঞা অনুসারে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড মানব সৃষ্ট আপদ এবং দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করা যায়।

মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ

মহামান্য হাইকোর্টে দ্বৈত বেঞ্চ কর্তৃক ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, শিল্প মন্ত্রণালয়, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এবং ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনারসহ বিবাদীদের বিরুদ্ধে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রতিরোধে পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরনো ঢাকার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অননুমোদিত ভবন নির্মাণ ও অননুমোদিতভাবে গুদাম/রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম/শিল্প কারখানা হিসেবে ভবন ব্যবহার এবং ভবনে দাহ্য পদার্থ অথবা পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য বা যে কোনো ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না সে বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করেন। এছাড়াও এই সকল অংশীজনকে লক্ষ্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন ও অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল; গঠিত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ঢাকার অননুমোদিত ভবন নির্মাণ, রাসায়নিক এবং বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পেশ; প্রয়োজনীয় স্থানে অগ্নি নির্বাপণের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনে কত সময় প্রয়োজন সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ; অগ্নি নির্বাপণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদ প্রচার মাধ্যমে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিবেদন তিন মাসের মধ্যে প্রদান; এবং ছয় মাসের মধ্যে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র স্থাপন এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় জরুরী বহির্গমন পথ নিশ্চিত করার প্রতিবেদন প্রদান করার বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করা হয়

নগর পরিকল্পনা গবেষকদের মতে, পরিকল্পিত নগর বিনির্মাণের দূরদৃষ্টির অভাব, নগর পরিকল্পনার অনুপস্থিতি, ঢাকাকে ঘিরে কেন্দ্রীভূত উন্নয়ন প্রবণতা, আন্তঃকর্তৃপক্ষ দায়িত্বের দ্বৈততা, দুর্বল উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, পরিকল্পনা প্রণয়নে পরিকল্পনাবিদদের সুযোগের অভাব, সমন্বয়হীনতাসহ প্রভৃতি সমস্যা আপদ ও দুর্যোগ তৈরির মতো পরিবেশকে ঘনীভূত করছে।[১২] পুরনো ঢাকার বিদ্যমান অপরিকল্পিত অবকাঠামোর কারণে উল্লেখিত সমস্যার আধিক্য রয়েছে এবং এ কারণে অগ্নিকাণ্ডসহ নানা দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে যাচ্ছে। আবার ঢাকা মেট্রোপলিটন উন্নয়ন পরিকল্পনা (১৯৯৫-২০১৫) অনুসারে পুরনো ঢাকার চিহ্নিত সমস্যাগুলো হচ্ছে:

- বেশিরভাগ ভবন দোতলা থেকে চারতলা এবং প্লটের ১০০% জমি ব্যবহার করে ভবন তৈরি করা হয়েছে; অননুমোদিত ভবন নির্মাণ; বাণিজ্যিক কাজে জমি, প্লটের বা ভবনের ব্যবহার বৃদ্ধি
- সরু রাস্তা ও বাণিজ্যিক এলাকাগুলোতে মালামাল উঠানো-নামানোর নির্দিষ্ট জায়গা না থাকা
- অপ্রশস্থ যাতায়াত ব্যবস্থা এবং ঘিঞ্জিভাবে দালান তৈরির কারণে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি বেশি
- ড্রেনেজ ব্যবস্থার ঘাটতি; পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি

সারণী ১: ঢাকা শহরের জনসংখ্যার ঘনত্ব[১৩]

ঢাকা মেট্রোপলিটন	থানার সংখ্যা	আকার (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)
পুরনো ঢাকা	৭টি	১৪.৬৬	৯৪,৩৮০ জন
নতুন ঢাকা	৩৪টি	৩২৭.৫৭	৩৯,৮৫৭ জন

[১২] "শহরের মানদণ্ডে ঢাকার সবকিছুতে ঘাটতি"। *সমকাল।* ২৫ মে ২০১৯

[১৩] আদমশুমারি ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

অপ্রশস্থ ও অপরিকল্পিত অবকাঠামোর পাশাপাশি পুরনো ঢাকার জনসংখ্যার ঘনত্বও এই এলাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে একটি উদ্বেগের কারণ। বিগত ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে, তৎকালীন ৭টি থানার (যা বর্তমানে ৮টি থানা) আওতাধীন পুরনো ঢাকার আকার ছিল ১৪.৬৬ বর্গ কি.মি. ও জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ১৩ লক্ষেরও অধিক এবং জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৪,৩৮০ জন। অন্যদিকে, ঢাকা মেট্রোপলিটনের বাকি এলাকার জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৯,৮৫৭ জন। উল্লেখ্য করা যেতে পারে যে, ঢাকা মেট্রোপলিটনের বাকী এলাকার আয়তন ছিল ৩২৭.৫৭ বর্গ কি.মি. এবং মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭৯ লক্ষ।[১৪] এটা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান যে, ঢাকার মেট্রোপলিটনের অন্যান্য এলাকার তুলনায় পুরনো ঢাকার জনসংখ্যা ঘনত্ব দ্বিগুণেরও বেশি এবং শহরের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬ ভাগের ১ ভাগ জনগণ এই এলাকায় বসবাস করে। ডেমোগ্রাফীয়া ওয়ার্ল্ড আরবান এরিয়া'র তথ্য অনুসারে বর্তমান বিশ্বের সর্বোচ্চ জনসংখ্যার ঘনত্ব ঢাকায় (৪১,০০০ জন/বর্গকি.মি.), দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বোচ্চ যথাক্রমে সোমালিয়ার মোগাদিসু (২৮,২০০ জন/বর্গকি.মি.) ও ভারতের সুরাট (২৭,৪০০ জন/বর্গকি.মি.)।[১৫] একারণে পুরনো ঢাকাসহ ঢাকা মেট্রপলিটনের অধিবাসীদের জন্য যে কোনো প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

কয়েকটি যৌক্তিকতাকে কেন্দ্র করে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রথমত, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি বলে অভিহিত করা হয়। সুশাসনের ঘাটতির ফলে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে কিনা সে সম্পর্কে সুগভীর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে নয় বছর আগে ঘটে যাওয়া নিমতলী ঘটনার শিক্ষা কতটুকু কাজে লাগানো হয়েছে তা নিয়ে গণমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা তৈরি হয়েছে। তৃতীয়ত, জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১ - এ "অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা" এর মাধ্যমে দুর্যোগের কারণে নগরে মৃত্যুর হার কমিয়ে আনা ও দুর্যোগ সহনশীল নগর নিশ্চিত করার প্রত্যয় অর্জনে বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। পুরনো ঢাকায় বসবাসরত নগরবাসীকে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করে দুর্যোগ সহনশীল নগর নিশ্চিত করতে সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। চতুর্থত, পুরনো ঢাকায় বসবাসরত নগরবাসীকে অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা ও সেগুলো নিরসনের জন্য গবেষণাটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি

গবেষণাটির উদ্দেশ্য হলো পুরনো ঢাকায় অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং করণীয় চিহ্নিত করা।

আর গবেষণার পরিধি নিম্নরূপ:

- অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান অংশীজনদের দায়িত্ব, সক্ষমতা ও কার্যক্রম
- বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি
- সুশাসনের বিভিন্ন নির্দেশকের ভিত্তিতে (সক্ষমতা, সমন্বয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অংশগ্রহণ, অনিয়ম ও দুর্নীতি) পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রমের পর্যালোচনা
- পুরনো ঢাকার আটটি থানার মধ্যে অগ্নি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকা (অপরিকল্পিত কাঠামো ও রাসায়নিক শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে এমন লোকালয়) এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত

যদিও ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে, তবুও বিশেষায়িত আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও নগরায়নের বিশেষ প্রেক্ষিত বিবেচনায় গবেষণাটি পুরনো ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে।

---

[১৪] আদমশুমারি ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো; http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/PopCen2011/Com_Dhaka.pdf (সর্বশেষ ভিজিট: ০৩/০৪/২০২০)

[১৫] http://www.demographia.com/db-worldua.pdf (সর্বশেষ ভিজিট: ০৩/০৪/২০২০)

১.৪ গবেষণার সীমাবদ্ধতা

গবেষণাটিতে ঢাকা মহানগরীর পুরো এলাকা এবং উল্লেখযোগ্য সকল অগ্নি দুর্ঘটনার চিত্র অন্তর্ভুক্ত না করায় গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় অজানাই থেকে যেতে পারে। আবার নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের বাইরে পুরনো ঢাকায় ছোট বড় অনেক অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে থাকলেও সেগুলোকেও এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ফলে পুরনো ঢাকার অগ্নি দুর্ঘটনা বিষয়ক কিছু তথ্য অজানাই থেকে যেতে পারে।

১.৫ প্রতিবেদন কাঠামো

এ প্রতিবেদনকে চারটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য ও পরিধি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে গবেষণার পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফল বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অর্থাৎ শেষ অধ্যায়ে গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে উপসংহার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: গবেষণা পদ্ধতি

২.১ গবেষণা এলাকা এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজন

গবেষণাধীন এলাকা হিসেবে পুরনো ঢাকার আটটি থানার মধ্যে অগ্নি ঝুঁকিপ্রবণ এলাকাগুলো (অপরিকল্পিত কাঠামো ও রাসায়নিক শিল্পভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রয়েছে এমন লোকালয়) এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বংশাল, চকবাজার, গেন্ডারিয়া, হাজারীবাগ, কোতয়ালি, লালবাগ ও সুত্রাপুর থানার অন্তর্ভুক্ত এলাকাসমূহ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ এলাকাসমূহের বিভিন্ন পাড়া-মহল্লার স্থানীয় বাসিন্দা, বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া, দোকান মালিক ও কর্মচারী, মার্কেট মালিক ও সমিতির নেতা, দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের কারখানা ও গুদাম মালিক, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারীসহ বিভিন্ন ধরনের মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সারণী ২: পুরনো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

সংশ্লিষ্ট অংশীজন	অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	ট্রেড লাইসেন্স প্রদান, অগ্নি ঝুঁকিসহ অন্যান্য সমস্যা চিহ্নিত করা, রাস্তাঘাট নির্মাণ
রাজউক	ইমারত তৈরির নকশা অনুমোদন, পরিদর্শন ও তদারকি, অকুপেন্সি সার্টিফিকেট প্রদান
ঢাকা ওয়াসা	ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন ও পানি সরবরাহ
শিল্প মন্ত্রণালয়	অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ এবং স্থায়ী রাসায়নিক পল্লী স্থাপন
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় কর্মসূচি গ্রহণ এবং দুর্ঘটনা পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন
ঢাকা জেলা প্রশাসন	আবাসিক এলাকা থেকে কলকারখানা সরিয়ে দেওয়া
কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর	কারখানা পরিদর্শন ও লাইসেন্স প্রদান; অতি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিতকরণ, সংস্কারের জন্য নোটিশ প্রদান ও ব্যবস্থা গ্রহণ
বিস্ফোরক অধিদপ্তর	বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ; রাসায়নিক পণ্য আমদানি, পরিবহন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা পরিদর্শন করে লাইসেন্স প্রদান
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	অগ্নি প্রতিরোধ ও অগ্নি নির্বাপণ
পরিবেশ অধিদপ্তর	কারখানা ও রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের গুদাম স্থাপনে পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান

২.২ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে সাক্ষাৎকার, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা, পর্যবেক্ষণ এবং সাহিত্য ও নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎসের ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নগর উন্নয়নবিদ ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকেও মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া, দোকান মালিক ও কর্মচারী, মার্কেট মালিক ও সমিতির নেতা, রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম মালিক, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে সাহিত্য ও নথি পর্যালোচনা করা হয়েছে - যার আওতায় ছিল প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রদত্ত নথি প্রভৃতি।

সারণী ৩: তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি, তথ্যের ধরন ও উৎস

উৎসের ধরন	তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ উৎস	**সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ**	বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া, দোকান মালিক ও কর্মচারী, মার্কেট মালিক ও সমিতির নেতা, রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম মালিক, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারী ইত্যাদি
	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা জেলা প্রশাসন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, নগর উন্নয়নবিদ, রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি
পরোক্ষ উৎস	**সাহিত্য ও নথি পর্যালোচনা**	প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ বিশ্লেষণ, সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা

গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে পুরনো ঢাকার কিছু রাসায়নিক পদার্থের কারখানা ও গুদাম মালিক, ব্যবসায়ী এবং কর্মীদের মধ্যে তথ্য গোপন করা এবং ত্রুটিপূর্ণ তথ্য প্রদানের প্রবণতা ছিল। সংগৃহীত তথ্যসমূহের বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সমাজ গবেষণার নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, নথি পর্যালোচনাও করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্য পেতেও সময়ক্ষেপণ হলেও তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতার স্বার্থে বিকল্প তথ্যের উৎস থেকে তা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

২.৩ বিশ্লেষণ কাঠামো

বিশ্লেষণ কাঠামোর অংশ হিসেবে প্রধান প্রধান অংশীজনদের দায়িত্ব, সক্ষমতা এবং চর্চা সুশাসনের ছয়টি নির্দেশকের আলোকে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। নির্দেশকগুলো হচ্ছে সক্ষমতা, সমন্বয়, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, জনঅংশগ্রহণ এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের সংগৃহীত তথ্যসমূহ সুশাসনের এই নির্দেশকগুলোকে বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে বিবেচ্য বিষয়সমূহ হলো সক্ষমতা নির্দেশকের অধীনে অংশীজনদের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, জনবল ও বাজেট পর্যালোচনা করা। সমন্বয় নির্দেশকের অধীনে অংশীজনে সমন্বয়, তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয় ও ফলো-আপ, লাইসেন্স প্রদানে তথ্য বিনিময়, আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে সহযোগিতার বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা। স্বচ্ছতা নির্দেশকের অধীনে ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্বচ্ছতা, সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্যের উন্মুক্ততার বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা। জবাবদিহিতা নির্দেশকের অধীনে তদারকি, ক্ষতিপূরণ প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা। জনঅংশগ্রহণ নির্দেশকের অধীনে ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনা ও কৌশল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সুপারিশ বাস্তবায়নে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা। এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি নির্দেশকের অধীনে লাইসেন্স প্রদান, সুপারিশ বাস্তবায়নে নিয়ম অনুসরণ, আদেশ প্রতিপালনের বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা।

তথ্য বিশ্লেষণের অংশ হিসেবে ২০১০ সালের নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও আন্তঃমন্ত্রণালয় টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতিও উল্লেখিত নির্দেশকের আলোকে পর্যালোচনা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি মহামান্য হাইকোর্ট একটি আদেশ জারি করে, যা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

সারণী ৪: বিশ্লেষণ কাঠামো

নির্দেশক	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
সক্ষমতা	আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি, জনবল ও বাজেট
সমন্বয়	অংশীজনের সমন্বয়, তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয় ও ফলো-আপ, লাইসেন্স প্রদানে তথ্য বিনিময়, আইন প্রয়োগে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের মধ্যে সহযোগিতা
স্বচ্ছতা	ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্বচ্ছতা, সুপারিশ বাস্তবায়ন সম্পর্কে তথ্যের উন্মুক্ততা
জবাবদিহিতা	তদারকি, ক্ষতিপূরণ প্রদান, অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা
অংশগ্রহণ	স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ - ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, পরিকল্পনা ও কৌশল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সুপারিশ বাস্তবায়ন
অনিয়ম ও দুর্নীতি	লাইসেন্স প্রদান, সুপারিশ বাস্তবায়নে নিয়ম অনুসরণ, আদেশ প্রতিপালন

২.৪ গবেষণার সময়সীমা

গবেষণার তথ্যে সংগ্রহের সময়কাল ছিল অক্টোবর ২০১৯ থেকে আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত। শুরুর দিকে উপরে উল্লেখিত পদ্ধতি ব্যবহার করে বাড়ির মালিক ও ভাড়াটিয়া, দোকান মালিক ও কর্মচারী, মার্কেট মালিক ও সমিতির নেতা, রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম মালিক, প্লাস্টিক কারখানার কর্মচারীদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরবর্তীতে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নগর উন্নয়নবিদ ও বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: গবেষণার ফলাফল

৩.১ পুরনো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

পুরনো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেগুলো নিম্নরূপ:

ক. ২০১০ সালে নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর প্রধানন্ত্রীর নির্দেশে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটি বিভিন্ন অংশীজনকে সম্পৃক্ত করে ১৭ দফা সুপারিশ পেশ করে।

খ. মহামান্য হাইকোর্ট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রতিরোধে পরিকল্পিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরনো ঢাকার স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনজীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অননুমোদিত ভবন নির্মাণ ও অননুমোদিতভাবে গুদাম/রাসায়নিক দ্রব্যের গুদাম/শিল্প কারখানা হিসেবে ভবন ব্যবহার এবং ভবনে দাহ্য পদার্থ অথবা পেট্রোলিয়াম জাতীয় পণ্য বা যে কোনো ক্ষতিকর দ্রব্যের ব্যবহার প্রতিরোধকল্পে প্রয়োজনীয় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না সে বিষয়ে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করেন। এছাড়াও তদন্ত কমিটি গঠন ও অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল; গঠিত টাস্কফোর্সের মাধ্যমে ঢাকার অননুমোদিত ভবন নির্মাণ, রাসায়নিক এবং বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম চিহ্নিত করে প্রতিবেদন পেশ; প্রয়োজনীয় স্থানে অগ্নি নির্বাপণের জন্য ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপনে কত সময় প্রয়োজন সে সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ; অগ্নি নির্বাপণে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংবাদ প্রচার মাধ্যমে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার প্রতিবেদন তিন মাসের মধ্যে প্রদান; এবং ছয় মাসের মধ্যে অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্র স্থাপন এবং অগ্নিকাণ্ডের সময় জরুরী বহির্গমন পথ নিশ্চিত করার প্রতিবেদন প্রদান করার বিষয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করা হয়।

গ. স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে ২০ এপ্রিল ২০১১ সালে ঢাকা মেট্রোপলিটন আবাসিক এলাকা হতে অননুমোদিত গুদাম/কারখানা অপসারণে দু'টি কমিটি গঠন করা হয়। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (বিসিক) ঢাকাকে সভাপতি করে রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি এবং সুগ্মসচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়কে সভাপতি করে ১৪ সদস্যের সমন্বয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ঘ. পরবর্তীতে এই দুই কমিটি ১৬ আগস্ট ২০১১ তারিখে তাদের প্রতিবেদন এবং সুপারিশ পেশ করে। রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটির সুপারিশকৃত স্থান একাধিকবার যাচাই-বাছাই ও পরিবর্তন করে অবশেষে গুদাম/কারখানা অপসারণের জন্য অস্থায়ী রাসায়নিক পল্লী হিসেবে শ্যামপুর, টঙ্গী এবং বিসিক রাসায়নিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক হিসেবে মুন্সীগঞ্জে স্থান নির্ধারণ করা হয়। চলতি ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে শ্যামপুরে কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

ঙ. চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্ন সরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন/প্রিতিষ্ঠানের ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১২ সদস্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে।

চ. ফায়ার সার্ভিস কর্তৃক চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর লালবাগ, সিদ্দিকবাজার ও সদরঘাট ফায়ার স্টেশনের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, মার্কেট, আবাসিক হোটেল, রেস্তোরাঁর মধ্য থেকে ঝুঁকিপূর্ণ ও অতি ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা চিহ্নিত করা হয়েছে। এই এলাকাগুলোতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে সম্ভাব্য কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক যে সকল জলাধার ব্যবহার করা যাবে তা চিহ্নিত করা হয়েছে। এর পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ছ. দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ সম্পর্কে ফায়ার সার্ভিস, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তরের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি চলমান রয়েছে। এই কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছে লিফলেট বিতরণ ও মাইকিং করা।

জ. চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর বিস্ফোরক অধিদপ্তর কর্তৃক দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের তালিকা প্রস্তুত করার উদ্যোগ চলমান রয়েছে।

ঝ. কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর অংশ হিসেবে ৪০০৯টি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিতকরণ এবং এর মধ্যে ৬০০টির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই প্রক্রিয়াটি বর্তমানে অব্যাহত রয়েছে।

ঞ. বিস্ফোরক অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, কলকারখানা অধিদপ্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক পুরনো ঢাকায় কারখানা স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল শর্ত পূরণ না হলে লাইসেন্স প্রদান বন্ধ রাখা হয়েছে।

ট. চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে বিস্ফোরক অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, কলকারখানা অধিদপ্তর ও ঢাকা জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে পাঁচটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয় এবং টাস্কফোর্স কর্তৃক অভিযানের অংশ হিসেবে পুরনো ঢাকার ঝুঁকিপূর্ণ ১০০টির অধিক কারখানা বন্ধ করা হয়।

৩.২ পুরনো ঢাকার অগ্নি দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ

৩.২.১ সক্ষমতা

সংশ্লিষ্ট আইন পর্যালোচনা

ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এ বহুতল ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই বিধিমালায় দশতলা বা ৩৩ মিটারের উর্ধ্বের ভবনগুলো বহুতল ভবন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে দশ তলার কম উচ্চতার ইমারত অগ্নি নিরাপত্তার বাইরে রয়েছে এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। আবার এই আইনে উল্লেখ না থাকায় ইমারতের নকশা অনুমোদনের আবেদনে কেবল স্থাপত্য নকশা জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক; এক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তা নকশা এবং কাঠামোগত নকশা জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। এই বিধিমালা অনুযায়ী আইন ভঙ্গের কারণে রাজউক ভবনের নির্মাণ কাজ স্থগিত বা অননুমোদিত কাঠামো ভেঙ্গে দিতে পারে। তবে আইন ভঙ্গের কারণে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে ভবন মালিকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থার নেয়ার বিষয় সম্পর্কে আইনে উল্লেখ নেই। এছাড়া ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ এবং ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ আইনে ভবন নির্মাণ ও এর বৈধ ব্যবহার নিশ্চিতে রাজউক কর্তৃক তদারকি/পরিদর্শনের নির্দেশনা না থাকায় দায়িত্বে অবহেলার কারণে রাজউক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০২ এবং বিধিমালা, ২০০৪ এ এসিড পরিবহনের জন্য বিশেষায়িত যানবাহন ব্যবহারের বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করা নেই। ফলে এসিড ব্যবসায়ীরা যে কোনো খোলা যানে করে যে কোন পরিমান এসিড বহন করেন যা বিপদজনক এবং দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়।

শ্রম আইন, ২০০৬ এ শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকের মৃত্যু ও স্থায়ী সম্পূর্ণ পঙ্গুত্ববরণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ আছে যা যথাক্রমে দুই লাখ ও আড়াই লাখ টাকা। ক্ষতিপূরণের নির্ধারনের প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসৃত নয় এবং নির্ধারিত এই পরিমাণ অপর্যাপ্ত।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুসারে কোন গুদাম বা কারখানার পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র না থাকলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেশগত দূষণ বন্ধে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার এখতিয়ার আইনে দেওয়া হয় নি। ছাড়পত্র না থাকলে পরিবেশ আইনের ১২ ধারা লংঘিত হয় মাত্র। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক শুধু নিয়মিত মামলা করার এখতিয়ার দিয়ে রাখা হয়েছে। এর ফলে ঝুঁকিপূর্ণ ও দূষণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়।

আইনের ঘাটতি

ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা ২০০৮, অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড ২০০৬ এ ভিন্ন ভিন্ন সীমার ভবনকে 'বহুতল ভবন' হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। বিভিন্ন আইনে বহুতল ভবনের ভিন্ন ভিন্ন সীমা হওয়ার কারণে জটিলতা দেখা দিয়ে থাকে, যা অগ্নি নিরাপত্তার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে দায় এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা তৈরির অন্যতম কারণ।

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক দাহ্য রাসায়নিক ও দাহ্য রাসায়নিক সম্পৃক্ত দ্রব্যের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আশেপাশের হোল্ডিং মালিকদের অনাপত্তিপত্র, ফায়ার সার্ভিস ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, কারখানা লিমিটেড হলে ইন-কর্পোরেট সার্টিফিকেট, বিধিবিধান মেনে চলার ব্যাপারে অঙ্গীকারনামা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। অন্যদিকে, কোনো প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যাপারে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র না দেখেই অন্য প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। যেমন রাজউক কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই ভবনের নকশা অনুমোদন দেওয়া হয়। আবার সিটি কর্পোরেশন

পরিবেশ ছাড়পত্র কিংবা রাজউক অথবা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক নকশা অনুমোদন ছাড়াই ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। এই সমস্যা দূর করতে দাহ্য রাসায়নিক পদার্থের লাইসেন্স প্রদানের জন্য একটি 'ইউনিক অথরিটি' গঠনের প্রস্তাব করা হয়, যেখানে জেলা প্রশাসনকে 'ইউনিক অথরিটি' হিসেবে গঠনের প্রস্তাব করা হয়। টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশগুলো দাহ্য রাসায়নিক ও লাইসেন্স সংক্রান্ত বিষয় বিধিবিধানে এখনো অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে ঝুঁকি অব্যাহত রয়েছে।

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশকৃত গুদামজাত করা, পাইকারি, খুচরা ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য কী পরিমাণ দাহ্য রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের করা যাবে সে সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এখনো প্রণীত হয় নি। ফলে রাসায়নিক দ্রব্যের যথেচ্ছ ব্যবহার অব্যাহত রয়েছে।

শ্রম আইন, ২০০৬ অনুযায়ী কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের সরাসরি আইন প্রয়োগের সুযোগ নাই। এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটি শুধুমাত্র শ্রম আদালতে মামলা করতে পারে। যদি কোন কলকারখানা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হয়, তাহলে তাদেরকে শুধু নোটিশ দিতে পারে। কিন্তু তাৎক্ষণিক কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি আইনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয় নি। এই প্রসংগে কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন "....আমাদের আইনে আর বেশি ক্ষমতা দেওয়া নাই। বর্তমান আইনে কোনো কারখানাকে সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষ হতে ১-২ বছর সময় লাগে। আবার আইন প্রয়োগ করার জন্য আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট নাই, ফোর্স নাই।" তিনি আরও বলেন, "পুরনো ঢাকার বেশিরভাগ কারখানা হয়তো অন্যদের কাছ থেকে লাইসেন্স বা ছাড়পত্র নিয়েছে। কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা কোনো লাইসেন্স নেয় নাই। এদের বিরুদ্ধে মামলা করে লাভ নেই। দেখা যায় জরিমানা দিয়ে এসেই তারা আবার কারখানা চালু করে দেয়। আমরা মামলা দিলে তারা বরং কমফোর্ট ফিল করে।" তিনি আরও বলেন, "কেউ আমাদের লাইসেন্স ছাড়া কারখানা তৈরি করলে আমরা শুধু তার বিরুদ্ধে মামলা দিতে পারি, ফ্যাক্টরি বন্ধ করতে পারি না।"

অন্যদিকে, শ্রম আইন, ২০০৬ এ প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের শিকার হলে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের কোনো দিক-নির্দেশনা নেই। কোনো মানদণ্ড অনুসৃত হয় না বলে অপর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। আবার, কোন অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক দুর্ঘটনার শিকার হয়ে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বরণের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি সম্পর্কে বিদ্যমান আইনে কোন উল্লেখ নেই। ফলে অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ অনুসারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেশগত দূষণ বন্ধে তাৎক্ষণিক বা দ্রুত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি আইনে সুস্পষ্ট কর হয় নি। এক্ষেত্রে দূষণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানকে উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করে তা পরিশোধ এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার রাখা হয়েছে। এবং প্রদত্ত নির্দেশ পালন করা না হলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদালতে মামলা করার সুযোগ রাখা হয়েছে। আবার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেশগত দূষণ প্রতিরোধে আগাম কোন ব্যবস্থার নেয়ার বিষয়েও আইনে কোন উল্লেখ নেই। ফলে ঝুঁকিপূর্ণ ও দূষণ সৃষ্টিকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা দেখা যায়।

কোনো প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যাপারে কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এক প্রতিষ্ঠানের প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র না দেখেই অন্য প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স প্রদান করে থাকে। যেমন রাজউকে পরিবেশ ছাড়পত্র ছাড়াই ভবনের নকশা অনুমোদন দেওয়া হয়। আবার সিটি কর্পোরেশন পরিবেশ ছাড়পত্র কিংবা রাজউক অথবা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক নকশা অনুমোদন ছাড়াই ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করে থাকে।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উঁচু ভবন থেকে উদ্ধার কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

কিন্তু পুরনো ঢাকার প্রশস্ত রাস্তাঘাট এবং জলাধার ও ফায়ার হাইড্রেন্টের অভাবে এই সক্ষমতা কাজে লাগানো দূরূহ। অন্যদিকে, বাবুবাজার এলাকার বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও তাদের সংগঠন কর্তৃক এখানে একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের দাবি থাকলেও তা বাস্তবায়ন না করা হয় নি।

নিমতলী ট্রাজেডির পর তদন্ত কমিটি প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি

সুপারিশ: সকল প্রকার দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা

অগ্রগতি: নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর ৬ জুন ২০১০ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ সমন্বয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় অননুমোদিত রাসায়নিক কারখানা/গুদাম অপসারণের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী ২০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে দু'টি কমিটি গঠন করা হয় যার একটি রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি এবং অন্যটি আন্তঃমন্ত্রণালয় টেকনিক্যাল কমিটি। সম্প্রতি দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯ এ অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

তবে, সাম্প্রতিক স্থায়ী আদেশাবলি সত্ত্বেও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় কোন কর্মসূচি বা বাজেট বরাদ্দ করা হয়নি। মূলত তদন্ত কমিটি কর্তৃক টাস্কফোর্স গঠনের এই সুপারিশটি বাস্তবায়িত হয় নি।

সুপারিশ: সকল কমিউনিটি সেন্টারে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা

অগ্রগতি: নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের প্রায় নয় বছর পরে, চুড়িহাট্টা অগ্নিকান্ড পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন থেকে এই বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলেও তা এখনো বাস্তবায়ন করা হয়নি। মূলত চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের আগ পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় নি, যা সুপারিশকে গুরুত্ব প্রদান না করার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ফায়ার সার্ভিসের পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে সিটি কর্পোরেশনকে তাগিদ প্রদান করা হয় নি। আবার দুর্ঘটনার আগে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধমূলক কোন কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব ফায়ার সার্ভিসের নেই বলে তাদের পক্ষ থেকে যুক্তি প্রদান করা হয়।

সুপারিশ: স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন করা

অগ্রগতি: ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক পুরনো ঢাকায় স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করার কাজটি এখনো বাস্তবায়ন হয় নি। ওয়াসা কর্তৃক সহসা এই সুপারিশ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বলে অপরাগতা প্রকাশ করা হয়েছে।[১৬]

ফায়ার হাইড্রেন্টের অনুপস্থিতির কারণে চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের সময় দুর্ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী বাড়ির পানি রিজার্ভার ও পুরনো কারাগারের পুকুর থেকে পাম্প ব্যবহার করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করা হয়েছিল। এভাবে পানি নিয়ে আসার ফলে ফায়ার সার্ভিসের সরবরাহ পাইপে পানির প্রেসারের ঘাটতি ছিল বলে ফায়ার সার্ভিস থেকে বলা হয়। মূলত, অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতাকে গুরুত্ব না দেওয়া ও পরিকল্পনাহীনতার কারণে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা হয় নি।

সুপারিশ: অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ বিধিমালা ২০০৩ এবং বাংলাদেশ ইমারত নির্মাণ বিধির কঠোর বাস্তবায়ন

অগ্রগতি: রাজউকের দাবি অনুযায়ী, তারা ঢাকা শহরের দশ তলার উর্ধ্বসীমার ভবন জরিপ করে যে সকল ভবনে ফায়ার এক্সিট ও হাইড্রেন্ট নেই বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এমন ভবনে তিন মাসের মধ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের তাগিদ দিয়ে নোটিশ প্রেরণ করেছে। এবং বর্তমানে যে কোনো দশ তলার উর্ধ্বসীমার ভবন তৈরির অনুমোদনের ক্ষেত্রে লে-আউট প্ল্যান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কর্তৃক পাশ হলেই তারা ভবনের নকশা অনুমোদন দিয়ে থাকেন বলে দাবি করা হয়।

রাজউকের নোটিশ অনুসারে ভবন মালিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে কিনা সে বিষয়ে ফলো-আপের ঘাটতি রয়েছে। এর পাশাপাশি যদি কোন ভবন মালিক কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে না থাকেন, সেক্ষেত্রে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে রাজউকের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে বলে দাবি করা হয়। রাজউকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও পরিকল্পনার অভাবে তদারকিতে ঘাটতির বিষয়টি লক্ষণীয় এবং অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণের ব্যবস্থা না রেখে ভবন নির্মাণ অব্যাহত রয়েছে।

সুপারিশ: অবৈধ বা অননুমোদিত গুদামের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ

অগ্রগতি: তদন্ত কমিটির সুপারিশ অনুসারে অবৈধ বা অননুমোদিত গুদাম চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, গুদামে মাঝে মধ্যে পুলিশি তল্লাশি চালানো হয়। তবে, তল্লাশির নামে

[১৬] *Dhaka Tribune (ইংরেজি ভাষায়) ২৮ এপ্রিল ২০১৯*

ব্যবসায়ীদেরকে হয়রানি এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করার অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই নিয়মবহির্ভূত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ী/গুদাম মালিকরা ব্যবসা অব্যাহত রাখতে পারছে ও লাভবান হচ্ছেন।

লাইসেন্স ছাড়া বা লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া দাহ্য রাসায়নিকের ব্যবসা, গুদাম, কারখানার বিরুদ্ধে নিয়মিত ও পরিকল্পিত তদারকির ক্ষেত্রে সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। শুধুমাত্র বিশেষ চাহিদা ভিত্তিক বা তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে অভিযান পরিচালনা করা হয় বলে পরিবেশ অধিদপ্তর, জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিস এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কর্তৃক জানানো হয়, যা পুরোপুরি অনিয়মিত ও অপরিকল্পিত। এর প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা উচ্ছেদের অভিযান বন্ধ হয়ে যাওয়া।

সুপারিশঃ বিদ্যুৎ সরবরাহের উন্মুক্ত লাইনের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরি এবং নিয়মিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার পরীক্ষা করা

অগ্রগতি: তদন্ত কমিটি কর্তৃক সম্ভাব্য দুর্ঘটনা পরিহার করতে মাসে অন্তত একবার ট্রান্সফরমার সরেজমিনে পরীক্ষা করার সুপারিশ থাকলেও, শুধুমাত্র বৈদ্যুতিক গোলযোগ হলে এবং বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করলে বিদ্যুৎ সরবরাহের লাইন এবং বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার পরীক্ষা করা হয়। উন্মুক্ত লাইনের ক্ষেত্রে সচেতনতা তৈরির সুপারিশ থাকলেও সে বিষয়ে দৃশ্যমান কোন কর্মকান্ড সম্পর্কে স্থানীয় লোকজন অবগত নয়। চুড়িহাট্টা অগ্নিকান্ডের তদন্ত রিপোর্ট অনুসারে, আগুন লাগার দুই মাসের অধিক সময় আগে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে এই এলাকায় সর্বশেষ বিদ্যুৎ লাইনের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ করা হয়। স্থানীয়দের তথ্যমতে, এই এলাকায় অতিরিক্ত পরিমাণে অবৈধ কারখানা থাকায় ট্রান্সফর্মারের ওপর বেশি চাপ পড়লেও দুর্ঘটনার ঝুঁকি কমাতে নিয়মিত পরীক্ষা করা হয় না। তাদের মতে, নিয়মিত ও পরিকল্পিতভাবে বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মার পরীক্ষা করা হয় না, শুধুমাত্র বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করলেই ট্রান্সফর্মার পরীক্ষা করা হয়।

সুপারিশঃ পুরনো ঢাকার ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা হতে জরুরী ভিত্তিতে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম ও দোকান অপসারণ

অগ্রগতি: নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর জরুরী ভিত্তিতে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম ও দোকান অপসারণের লক্ষ্যে কিছুদিন জায়গা নির্বাচনের চেষ্টা থাকলেও পরে তা আর বাস্তবায়ন হয় নি। অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার তিন দিন পর ৬ জুন ২০১০ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির জরুরি সভায় ঢাকা মেট্রোপলিটন আবাসিক এলাকা থেকে অননুমোদিত রাসায়নিকের গুদাম/কারখানা অপসারণের জন্য একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এই টাস্কফোর্স গঠনের প্রায় ১০ মাস পর ২০ এপ্রিল ২০১১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান/জায়গা নির্ধারণে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি গঠনের প্রায় চার মাস পর ১৬ আগস্ট ২০১১ তারিখে অর্থাৎ অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হবার ১৪ মাস পর প্রাথমিকভাবে কেরানীগঞ্জে সোনাকান্দায় স্থান/জায়গা নির্ধারণ করা হয়। এরপর এই বিষয়ে আর কোন দৃশ্যমান অগ্রগতি হয় নি। এরপর অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হবার প্রায় পাঁচ বছর পর ১১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় একটি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ি সম্ভাব্যতা যাচাই করে কেরানীগঞ্জের ব্রাহ্মণকৃত্তা নামক স্থান নির্বাচন করা হয় এবং এই প্রকল্প ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অর্থাৎ নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের আট বছরের অধিক সময় পর একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের সময় চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হলে পুনরায় রাসায়নিকের গুদাম ও কারখানা তাৎক্ষনিক স্থানান্তরের অংশ হিসেবে আবার কিছু অভিযান পরিচালন করা হয় , যা পরবর্তীতে স্তিমিত হয়ে যায়। মূলত, নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের প্রায় ১০ বছর পর ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে শুধুমাত্র শ্যামপুরে অস্থায়ী গুদাম নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীদের তথ্যমতে, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর সরকারের পক্ষ থেকে কিছু অভিযানের ফলে ব্যক্তি উদ্যোগে কিছু গুদাম কেরানীগঞ্জে স্থানান্তর করা হয়েছে।

কিন্তু, প্রকৃত অর্থে জায়গা নির্ধারণ না করায় রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের কোনো গুদাম ও দোকান অপসারণ করা হয় নি। কারণ ব্যবসায়ীদের উল্লেখ করা এলাকা মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর স্থানান্তর করা হয়েছে এমন কোনো গুদাম এখানে খুঁজে পাওয়া যায় নি। মূলত, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর রাসায়নিক গুদাম অপসারণের বিষয়টি পুনরায় সামনে চলে আসে। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পূর্বে এ সুপারিশ বাস্তবায়নকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয় নি বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

সুপারিশঃ আবাসিক এলাকায় সকল প্রকার দাহ্য পদার্থের মজুদ ও বিক্রি নিষিদ্ধ করা

অগ্রগতি: বিস্ফোরক অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের তথ্যমতে, আবাসিক এলাকায় সকল প্রকার দাহ্য পদার্থের মজুদ ও বিক্রি বন্ধ করতে লাইসেন্স প্রদান স্থগিত করা হয়েছে, যা কিনা আংশিক বাস্তবায়ন বলে গণ্য করা যায়। বিস্ফোরক অধিদপ্তরের তথ্যমতে, নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের আগে পুরনো ঢাকায় কয়েকটি বিস্ফোরক গুদামজাত করার অনুমোদন দেওয়া ছিল। এই অগ্নিকাণ্ডের পর গুদামগুলো অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার পর তাদের পুনরায় অনুমোদন দেওয়া হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের

উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের ভাষ্যমতে, যে সকল প্রতিষ্ঠান ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি বা নবায়নের জন্য আবেদন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি থাকলে তাদেরকে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হয় না। অন্যদিকে, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর কলকারখানা অধিদপ্তর কর্তৃক ৪০০৯টি ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা চিহ্নিত করে এর মধ্যে ৬০০টির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স কর্তৃক ঝুঁকিপূর্ণ ১০০টির অধিক কারখানা বন্ধ করা হয়েছে মাত্র।

কিন্তু নিয়মবহির্ভূত অর্থ, রাজনৈতিক প্রভাব এবং অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজসে ব্যবসার নাম বা ধরন পরিবর্তন করে কিছু ক্ষেত্রে লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন এখনো অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের এক বছর পার না হতেই সম্প্রতি ১৬তম সেক্টর ডেভলপমেন্ট পলিসি কোঅর্ডিনেশন মিটিং-এ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত "নিয়ম-কানুন মেনে পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠানকে" দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক যথাক্রমে ট্রেড লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন করার প্রক্রিয়া চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে টাস্কফোর্স কর্তৃক বন্ধ কারখানা পুনরায় চালু করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে ফলো-আপে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও প্রকাশ্যেই এই সব পণ্যের পরিবহণ, মজুদ, পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ/পুনঃউৎপাদন ও বিক্রি অব্যাহত রয়েছে।

সুপারিশঃ রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় নিশ্চিত করা

অগ্রগতিঃ তদন্ত কমিটি কর্তৃক রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের লাইসেন্স প্রদানের জন্য টেকনিক্যাল কমিটি কর্তৃক একটি ইউনিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল যা এখনও বাস্তবায়ন করা হয় নি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং বিস্ফোরক অধিদপ্তর মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও তদারকির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমন্বয় বৃদ্ধির বিষয়টি দাবি করা হয়েছে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিধির অজুহাতে সমন্বয়ের পরিবর্তে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং অন্য দপ্তরকে এই কাজের জন্য দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা লক্ষণীয় মাত্রায় বিদ্যমান।

লাইসেন্স প্রদান বা নবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের সাথে সমন্বয়হীনতার বিষয়টি প্রায় আগের মতো বিরাজ করছে। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে অন্যান্য অংশীজনদের অনাপত্তিপত্র গ্রহণের বিষয়টিকে অবজ্ঞা করা হয় থাকে।

সুপারিশঃ আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের মজুদ ও বিক্রি বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি

অগ্রগতিঃ অগ্নিকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার কয়েকদিন পর পর্যন্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক দোকান, মার্কেট, কারখানা মালিকদের সাথে সভা, মাইকিং, প্রশিক্ষণ, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থ অপসারণের বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়। মূলত আগুন লাগার পর কয়েকদিন ধরে এসব কর্মকাণ্ড চললেও কিছুদিন পর সেগুলো চলমান থাকে না। আবার আবাসিক এলাকার ভবনসমূহে গুদাম থাকলেও সেখানে তৎপরতা কম থাকে। অন্যদিকে ব্যবসার স্থান পরিবর্তন করতে বলার প্রতিবাদে ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ মিছিল-মিটিং করার ঘটনা রয়েছে এবং বাড়ির মালিকদের এখনো গুদাম ও কারখানাকে ভাড়া দেয়ার আগ্রহ প্রমাণ করে যে জনসচেতনতামূলক এই কার্যক্রমগুলো ফলপ্রসূ হয় নি।

সুপারিশঃ পাঠ্য বইয়ে উদ্ধার অভিযান ও প্রাথমিক চিকিৎসার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা

অগ্রগতিঃ প্রাথমিক পর্যায়ে চতুর্থ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচিতি বইয়ের দুর্যোগ মোকাবিলা অধ্যায়ে আগুনের প্রভাব, আগুন লাগার কারণ, আগুন মোকাবিলা সংক্রান্ত প্রাথমিক কিছু তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে, বইটিতে অগ্নিকাণ্ডের সময় করণীয় বা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এছাড়া শিশুদের উপযোগী অপরিহার্য নির্দেশিকাও এই পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। এছাড়া অগ্নিকান্ডের সময় আত্মরক্ষামূলক জরুরী বিষয়সমূহ, প্রাথমিক চিকিসার বিষয়গুলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পর্যায়ের অন্য কোনো শ্রেণীতে বিশেষ করে মাধ্যমিক পর্যায়ে উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, তদন্ত কমিটি প্রদত্ত ১৭টি সুপারিশের মধ্যে মাত্র আটটি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে, কোনো ধরনের বাস্তবায়নের মুখ দেখে নি নয়টি সুপারিশ।

সারণী ৫: নিমতলী ট্রাজেডির পর তদন্ত কমিটি প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

সুপারিশ	বাস্তবায়নের অগ্রগতি	সুপারিশ	বাস্তবায়নের অগ্রগতি
১. আবাসিক এলাকা থেকে গুদাম বা কারখানা সরানো	বাস্তবায়ন হয় নি	১০. ট্রান্সফরমার সরেজমিনে পরীক্ষা করা	বাস্তবায়ন হয় নি
২. অনুমোদনহীন কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	আংশিক বাস্তবায়ন	১১. দুর্ঘটনা মোকাবেলায় জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন	বাস্তবায়ন হয় নি
৩. আইন ও বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ভবন নির্মাণ	আংশিক বাস্তবায়ন	১২. বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়	আংশিক বাস্তবায়ন
৪. লাইসেন্স প্রদানে তদারকি বৃদ্ধি	আংশিক বাস্তবায়ন	১৩. ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বাড়ানো	আংশিক বাস্তবায়ন
৫. জনমত তৈরি	আংশিক বাস্তবায়ন	১৪. আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতা বৃদ্ধি	আংশিক বাস্তবায়ন
৬. স্থানীয়ভাবে হাইড্রেন্ট পয়েন্ট স্থাপন	বাস্তবায়ন হয় নি	১৫. পাঠ্যসূচিতে অগ্নিকান্ড, উদ্ধার ও চিকিৎসার বিষয় বাধ্যতামূলক করা	আংশিক বাস্তবায়ন
৭. আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক মজুদ বা বিক্রি নিষিদ্ধ করা	বাস্তবায়ন হয় নি	১৬. ৬২,০০০ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা	বাস্তবায়ন হয় নি
৮. বৈদ্যুতিক তারের গুণগত মান নিশ্চিত করা	বাস্তবায়ন হয় নি	১৭. কমিউনিটি সেন্টারে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রাখা	বাস্তবায়ন হয় নি
৯. খোলা তারের ব্যাপারে সাবধানতা তৈরি	বাস্তবায়ন হয় নি	-	-

জনবল ও বাজেট ঘাটতি

পরিবেশ আদালত পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে লোকবল ও বাজেটের স্বল্পতা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্তকর্তা বলেন, "ঢাকা শহরের দুই কোটি মানুষকে সেবা দেওয়ার জন্য আমরা ছয় জন মানুষ আছি। গাড়ি আছে মাত্র একটি। গাড়ি যদি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার প্রয়োজন হয় তখন আমরা বাসে ঝুলে-ঝুলে পরিদর্শনে যাই।" তিনি আরও বলেন, "একটা সার্ভে করার জন্য লোকবল লাগবে, বাজেট লাগবে। আমরা বাজেট চাই, কিন্তু পাই না। আপনার দৈনন্দিন চাল-ডালের প্রয়োজন, আর সেই বাজেট যদি পোষাক কেনার জন্য আর উৎসবের খরচের জন্য রেখে দেন, তাহলে তো হবে না।" আবার লোকবল স্বল্পতার কারণে যথাসময়ে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ একই ব্যক্তি দপ্তরে একাধিক পদের কাজ করে থাকেন এবং সরকার কর্তৃক প্রতিনিয়ত নতুন ইস্যু নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হয়। ফলে পূর্ববর্তী কাজ বা মামলাগুলোতে সময় দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে মামলায় দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি হয়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ১৯৯০ সালের অর্গানোগ্রাম অনুসারে যত লোক থাকার কথা ২০১৯ সালে তার থেকে আরও কমানো হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অথচ তাদের কাজের পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। সংস্থাটির নগর পরিকল্পনা ও রাজস্ব বিভাগে জনবল হ্রাস করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২,৪২২টি পদের বিপরীতে ৬৮৪টি (২৮.৩%) শূন্য পদ রয়েছে।[১৭] এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা বলেন, "৮ বছর যাবৎ সিটি কর্পোরেশনে কোনো নিয়োগ হচ্ছে না। নির্দিষ্ট পদের এক ব্যক্তি একাধিক পদের কাজ করছেন। জনবলের সংখ্যা অনেক কম। আর যেসব জনবল আছে তাদের

[১৭] The Daily Star *(ইংরেজি ভাষায়)* | *৭ জানুয়ারি ২০২০*

দক্ষতার পার্থক্য রয়েছে। এক তৃতীয়াংশ জনবল নিয়ে সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে। এর ফলে মাঠ পর্যায়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে না।"

কলকারখানা অধিদপ্তরের জনবল ঘাটতি প্রসঙ্গে একজন কর্মকর্তা বলেন, "দেশে এক লক্ষ কারখানা আছে যা শ্রম আইনের আওতায় পড়ে। অধিদপ্তরের ৫৭৫ জনের মধ্যে কর্মরত ৩৩৪ জন পরিদর্শক দিয়ে সবগুলো কারখানা পরিদর্শন করতে ১০০ বছর লাগবে। আর এক বছরের মধ্যে সবগুলো কারখানা পরিদর্শন করতে চাইলে ২০,০০০ পরিদর্শক প্রয়োজন।" উল্লেখ্য যে, পুরনো ঢাকার জন্য এই দপ্তরটিতে মাত্র ৬ জন পরিদর্শক রয়েছেন।

আবার রাজউকেরও জনবল স্বল্পতা রয়েছে। তাদের আরও কিছু পরিদর্শকের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। জমির মালিক কর্তৃক আইন অমান্য করা এবং সেক্ষেত্রে তদারকির জন্য তাদের জনবলের স্বল্পতা সম্পর্কে রাজউকের একজন কর্মকর্তা বলেন, "৯০% লোক আইন ও নকশা মেনে ভবন তৈরি করে না। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের প্রতিটি দালানের জন্য একজন পরিদর্শকের প্রয়োজন।"

বিস্ফোরক অধিদপ্তরের জনবল ঘাটতি প্রসঙ্গে একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের পরিদর্শক ৩ জন, আর সহকারী পরিদর্শক ৩ জন। আমাদের লজিস্টিক্সের ঘাটতি রয়েছে। আমাদের সারা দেশে অনুমোদিত জনবল ১০৪ জন। ২ বছর আগে আমরা ২৯০ পদের জন্য চাহিদা দিয়েছি।"

অগ্নিকাণ্ডের সময় কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি বিদ্যমান। জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন অফিসের একজন বলেন, "আমাদের অফিসের জনবল বাড়াতে হবে। আগুনের মতো দুর্ঘটনায় প্রাথমিক সাড়া দানের জন্য কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরি করতে হবে। বর্তমানে যা আছে তা আমাদের কাজের জন্য খুবই সীমিত।"

দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী ২০১৯-এ অগ্নিকাণ্ড ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের উল্লেখ থাকলেও তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও মোকাবেলায় দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কোন কর্মসূচি বা বাজেট বরাদ্দ নেই।

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি

রাজউকের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আইন প্রয়োগের জন্য আমাদের ১০০ জনের একটি ফোর্সের প্রয়োজন, যা আমরা মৌখিকভাবে জানিয়েছি।" তিনি আরও বলেন, "আমরা প্রতি মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করি ৩-৪টি, যা পর্যাপ্ত নয়। কারণ নিয়ম ভংগ হয় ধরেন ৩০০টি।"

আবার অগ্নিকাণ্ড হলে ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসনের জন্য নামেমাত্র অনুদান প্রদানের মধ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্যোগ প্রতিরোধে তাদের পৃথক কোনো বাজেট নেই। এ প্রসংগে একজন ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা বলেন, "পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের কী কী ঝুঁকি আছে তার জরিপ আমরা কখনো করি নাই।"

বিস্ফোরক অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আবাসিক এলাকায় এতো বড় পারফিউমের মজুদ কেউ রাখতে পারে না। পারফিউমে বিউটেন ব্যবহার করা হয় যা দাহ্য পদার্থ এবং আমদানীর ক্ষেত্রে এটা ফ্রী আইটেম। হয়তো পারফিউমের বিউটেন বা রেক্টিফাইড স্পিরিট বাতাসে এসে মিশ্রণ তৈরি করেছিল। তার ফলে হয়তো বিস্ফোরণ ঘটার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ হয়েছিল।" কিন্তু তাদের অগোচরেই এসব দ্রব্যের মজুদ করা হয়। কিন্তু তারা এসবের নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না।

দাহ্য পদার্থ ও রাসায়নিক সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানের ঘাটতি

চুড়িহাট্টায় আগুন লাগার পর ৫টি টাস্কফোর্স কর্তৃক অবৈধ রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম ও কারখানা অপসারণের লক্ষ্যে পুরনো ঢাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। ব্যবসায়ীদের মতে, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর সংশ্লিষ্ট টাস্কফোর্স সদস্যদের মধ্যে যারা দোকানে দোকানে তদন্ত করতে গিয়েছিলেন তাদের রাসায়নিক সম্পর্কে জ্ঞানের ঘাটতি ছিল। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, "দোকানে কোনো বস্তা বা ড্রাম দেখলেই তারা দাহ্য রাসায়নিক বলে মামলা দিয়েছে।"

আবার ব্যবসায়ীরা অনেক পদার্থকে দাহ্য হিসেবে স্বীকার করেন না। তাদের মতে, ৩৫ এর মতো রাসায়নিক পদার্থকে দাহ্য হিসেবে গণ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমরা দাহ্য পদার্থের একটি তালিকা তৈরি করছি। এমনি একটি তালিকা আছে, তা ব্যবসায়ীদের বানানো। এই তালিকা পরে আমাদের হয়ে গিয়েছে! আমরা ছোট বিভাগ, তাই আমরা কোনো কিছু বললেও তা বড় ব্যবসায়ীদের সংগঠনের ভীড়ে হারিয়ে যায়। আসলে দাহ্য পদার্থ আছে ১,০০০-এর উপরে।"

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা

মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, আমাদের পরিদর্শনকৃত অধিকাংশ বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের প্রস্তুতি যেমন আগুন নেভানোর যন্ত্রপাতি, বালি, পানি ইত্যাদির ব্যবস্থা নেই। আর সিটি কর্পোরেশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক অগ্নি প্রতিরোধে মার্কেট ও দোকানসমূহে বালি, পানি ও ফায়ার এস্টিংগুইসার রাখার পরামর্শ প্রদান করা হলেও সেগুলো রাখার জন্য জায়গার অপ্রতুলতা রয়েছে।

পানি সংকট পুরনো ঢাকার একটি পুরাতন সমস্যা এবং অনেক ছোট-ছোট প্লটে তৈরি বা পুরাতন বাড়িতে পানি জমিয়ে রাখার জন্য রিজার্ভ ট্যাংকের অভাব রয়েছে। এ কারণে পানি জমিয়ে রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার পাশাপাশি আগুন নেভানোর মতো জলাশয়ের অভাব পুরনো ঢাকায় প্রকট। সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতে, বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ব্যবহার করে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা সম্ভব। কিন্তু ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক ২০২২ সালের আগে এখানে স্বতন্ত্র ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করা সম্ভব নয় বলে জানানো হয়েছে।[১৮] যেহেতু পুরনো ঢাকার সর্বত্র ১০ তলা বা তার উপরে ভবন তৈরি করার অনুমোদন দেওয়া নেই, তাই এর থেকে কম উচ্চতার ভবন তৈরি করলে সেখানে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে তারা বাধ্য নয়। আবার ভবন মালিকদের পক্ষ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুনমোদিতভাবে ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন না করেই ১০ তলার উপরের ভবন তৈরি করা হয়েছে।

রাসায়নিক কারখানা, গুদাম ও ব্যবসা অপসারণে উদ্যোগের ঘাটতি

পুরনো ঢাকায় আবাসিক ভবন বা বহুতল ভবনে বিশেষ করে নিচ তলায় রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর ও দাহ্য পদার্থের দোকান, গুদাম ও কারখানার উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য অনুযায়ী এই সকল প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দাহ্য পদার্থ এবং অগ্নিকাণ্ড সহায়ক পদার্থের পাইকারী ব্যবসা করে থাকে। বিদ্যমান দাহ্য পদার্থের ব্যবসার মধ্যে রয়েছে প্লাস্টিক দানা, খাবারের ফ্লেভার, পারফিউম/সুগন্ধি করাখানা; পুরনো পারফিউম/সুগন্ধির বোতল/ক্যান শোধনাগার ও গুদাম; খুচরা কাগজের ব্যবসা; কাগজের মার্কেট; পলিথিন তৈরির কারখানা; পুরনো বা ব্যবহৃত পলিথিন ও প্লাস্টিকের গুদাম, শোধনাগার ইত্যাদি। একজন জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তার মতে, "ব্যবসায়ীরা বলে যে তারা গুদাম সরিয়ে নিয়েছে। আসলে তারা হাইড করে। এগুলো আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।" শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, "গুদাম বা কারখানা কোথায় স্থানান্তর করা হয়েছে তার অফিসিয়াল ডাটা আমাদের কাছে নেই। এগুলো আমাদের কাছে আসতে অনেক সময় লাগে। অফিসিয়াল হিসেবে নয়, নাগরিক হিসেবে বলতে পারি যে, এই সব গুদাম বা কারখানা এখানে থেকে সরে যায় নাই।"

সিটি কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদপ্তর, কলকারখানা অধিদপ্তরের মতে, এই এলাকায় লাইসেন্স বা ছাড়পত্র প্রদান বন্ধ রয়েছে। তারপরও এখানে এই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আধিক্য প্রমাণ করে যে, লাইসেন্স ছাড়া বা মেয়াদোত্তীর্ণ লাইসেন্স নবায়ন না করেই দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর ব্যবসা, গুদাম, কারখানা গুলো চলমান রয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধিকাংশ কারখানায় নকল পণ্য তৈরি করা হয় এবং রাসায়নিকের ব্যবহারও ব্যাপক আকারে হয়। এই সকল ব্যবসার সাথে সংশ্লিষ্টরা বলেন, যারা উৎপাদনের সাথে জড়িত তাদের যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞান না থাকায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকেই যায়। উর্দু রোডের একজন ভাড়াটিয়ার মতে, "এ এলাকার বেশিরভাগ বাসার নিচে বিভিন্ন রাসায়নিক ও প্লাস্টিকের গোডাউন রয়েছে। এজন্য ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কে থাকেন। বাড়ির মালিকরা এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা নেন না।" আবার একজন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর দোকান মালিকের মতে, "বিস্ফোরক অধিদপ্তর থেকে লাইসেন্স নিতে হয়। সেই লাইসেন্স পেতে ২/৩ বছর সময় লাগে এবং ১.৫-২ লক্ষ টাকা লাগে, মানে ঘুষসহ। তাই আমি লাইসেন্স নেই নাই। রিস্ক নিয়া রাখি।"

[১৮] *Dhaka Tribune (ইংরেজি ভাষায়) ২৮ এপ্রিল ২০১৯*

বিদ্যুতের অব্যবস্থাপনা

কলকারখানা অধিদপ্তরে মতে, শিল্প-কারখানায় বিদ্যুতের লোড অনুযায়ী অনুমোদিত কোম্পানী/ঠিকাদার দিয়ে ওয়্যারিং করানো এবং বিদ্যুৎ বিভাগের প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক বা বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার কাছে থেকে ছাড়পত্র নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিসের তথ্য অনুসারে বেশিরভাগ অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয় শর্টসার্কিট থেকে। পুরনো ঢাকায় আবাসিক ভবনেই কারখানা স্থাপন করা হয় বলে সেগুলো লোড নিতে সক্ষম হয় না। লালবাগের একজন বাড়ির মালিক বলেন, "এখানে প্রায় প্রতিটা বাড়ির নিচে প্লাস্টিকের পণ্য তৈরির কারখানা রয়েছে। এত বিপুল পরিমাণে কারখানা থাকায় বিদ্যুতের ওপর ব্যাপক চাপ পড়ে। এছাড়া বিদ্যুৎ অফিস থেকে মনিটরিং এর ঘাটতি থাকায় প্রায়ই বিদ্যুতের শর্টসার্কিট হয় কিংবা ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে যায়।" আবার ক্ষেত্রবিশেষে এই সব ভবনে নিম্ন মানের বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করা হয়। ফলে শর্টসার্কিট বা ট্রান্সফর্মার বিস্ফোরণ হয়। এই প্রসঙ্গে একজন ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা বলেন, "কিছু দরিদ্র ও অসচেতন লোক আছে যারা সস্তা বৈদ্যুতিক তার ব্যবহার করে, এদের কারণে পুরা কমিউনিটি হুমকির মুখে পড়ে।"

ছবি: যত্রতত্র তারের ছড়াছড়ি

এছাড়া বিদ্যুৎ বিভাগ ওয়্যারিং চেক না করেই ছাড়পত্র দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে কারখানা স্থাপন এবং সেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের বিষয়টিকে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। পুরনো ঢাকার একজন রাসায়নিক কারাখানা ও গুদাম মালিক বলেন, "পুলিশ ও বিদ্যুৎ অফিসের লোকেরা এসব ব্যবসায়ীদের দোস্ত লাগে। অবৈধভাবে ব্যাটারি চার্জ দেয়। কিন্তু বিদ্যুৎ অফিস এসব চেক করতে আসে না।" বৈদ্যুতিক তার, ট্রান্সফর্মার এলোমেলোভাবে বাড়ির সাথেই লাগানো অবস্থায় দেখা গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মারের পাশে অবস্থিত বাড়িতেও রাসায়নিকের গুদাম স্থাপনের বিষয়টি দেখা গিয়েছে। ফলে আগুন লাগলে তা ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি বেশি এখানে অনেক বেশি।

পরিকল্পনার অভাব

প্রায় সব সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনায় শুধুমাত্র বৈধ রাসায়নিক ব্যবসায়ীরা গুরুত্ব পেয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের বক্তব্য থেকে। একজন কর্মকর্তার মতে, "আমরা বৈধ বা যাদের লাইসেন্স আছে তাদের রাসায়নিক পল্লীতে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছি। এই ক্ষেত্রে যারা অবৈধ তারা বাহিরে থেকে যাবে, এবং একটা ঝুঁকি থেকেই যাবে। ...তাদের লাইসেন্স দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের না।"

রাজউকের বক্তব্য অনুসারে পুরনো ঢাকাকে কেন্দ্র করে তাদের বিশেষ কোনো কর্মপরিকল্পনা নেই। তারা সমগ্র ঢাকা শহর নিয়ে পরিকল্পনা করে থাকে। রাজউকের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমরা সমগ্র ঢাকায় যাদের ভবন ১০ তলার উর্ধ্বে কিন্তু ফায়ার এক্সিট নাই, ফায়ার হাইড্রেন্ট নাই, অনুমোদনের বাহিরে ১-২ তলা বাড়িয়েছে তাদেরকে করণীয় সম্পর্কে জানিয়ে নোটিশ দিয়েছি...তারা আমাদের উত্তর দিচ্ছে...সময় চাচ্ছে...অজুহাত দেখাচ্ছে। এই উত্তরগুলো নিয়ে কী করা হবে তা আমরা জানি না।"

অন্যদিকে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর শুধুমাত্র বন্যা ও ঘুর্ণিঝড়কে দুর্যোগ হিসেবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। অগ্নিকাণ্ড ও পুরনো ঢাকার ঝুঁকি সর্বোপরি অন্য সকল দুর্যোগ নিয়ে কোনো পরিকল্পনা না থাকার অসহায়ত্বের কথা জানিয়েছে। অধিদপ্তরটি তাত্ত্বিকভাবে কী করা প্রয়োজন তা জানলেও এই সংক্রান্ত কোনো পরিকল্পনা ও কর্মকান্ড হাতে নেয় নি।

তবে, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলো কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর। অধিদপ্তরটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ও বাস্তবায়নকারী ঠিক করে ৫টি লক্ষমাত্রা নিয়ে কর্মরত আছে। জনবলের স্বল্পতার কারণে কিছু কিছু লক্ষ্যে তারা পিছিয়ে থাকলেও তারা তাদের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে।

৩.২.২ সমন্বয়

তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি

অপরিকল্পিত আবাসন

পুরনো ঢাকায় অপর্যাপ্ত ও অপ্রশস্ত রাস্তা থাকার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক অংশীজন স্বীকার করেন। অপর্যাপ্ত ও অপ্রশস্ত রাস্তা প্রশস্তকরণে রাজউকের সাথে সমন্বয় করে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উদ্যোগের ঘাটতি এবং দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মধ্যে দেখা গিয়েছে। বাড়ির মালিক রাস্তার জন্য জায়গা না ছেড়েই বাড়ি করা সম্পর্কে রাজউক কর্তৃক তদারকির ঘাটতির বিষয়টি এড়িয়ে যেতে একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমরা গ্রাম্য জীবন থেকে শহুরে জীবনে এখনো অভ্যস্ত হতে পারি নাই। এছাড়াও আমার জমি আমি কেন ছাড়বো এই ধরনের মানসিকতা রাস্তাগুলোর এই অবস্থা হওয়ার জন্য দায়ী।" এছাড়া রাস্তা প্রশস্তকরণে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক উদ্যোগের ঘাটতিও রয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা বলেন, "পুরনো ঢাকায় অনেক বাড়ি রয়েছে যেখানে পর্যাপ্ত দরজা জানালা নেই। এছাড়া একটি ভবনের সাথে আরেকটা ভবন অত্যন্ত লাগোয়া অবস্থায় তৈরি করা হয়। আবার একই কক্ষে রান্না, চুলা, থাকা-খাওয়া সব একসাথে। বাতাস চলাচলের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। কোনো সেইফব্যাক না রেখে ৬-৭ তলা বাড়ি করে ফেলছে অনেকে। সেগুলোর সিঁড়ি অত্যন্ত চাপা ও সরু। বিল্ডিংগুলোর নিজস্ব অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নেই।" মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকালেও এমনটি লক্ষ করা গিয়েছে। এই সব ভবনে আগুন লাগলে সহজে বের হওয়া বা উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা দূরূহ হয়ে পড়ে।

ছবি: সরু ও অপ্রশস্ত গলি

টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয়ের ঘাটতি

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ প্রেরণ ও দীর্ঘ বিরতিতে সভা আয়োজনের মধ্যে কার্যক্রম ও যোগাযোগের সমন্বয়মূলক কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। এ সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, "সমন্বয়ের দায়িত্ব আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা আমাদের কাজ না। যাদের যে দায়িত্ব তাদেরকে সেটা ২০১৪ সালে মিটিং করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা দায়িত্ব ভাগ করে দিয়েছি, সেই অনুযায়ী তারা কাজ করবে। কিন্তু সেটা তারা করছে না।" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "সমন্বয় বলতে আপনারা যে রকম বোঝেন সেই রকম নয়। সমন্বয়ের জন্য একটা কমিটি ছিল। যেটা এখন অকার্যকর। এখন মিটিং হওয়া বন্ধই বলা যায়।" বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য ব্যবস্থাপনার ঘাটতি প্রকাশ পায় এসব বক্তব্যের মাধ্যমে।

রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণে সমন্বয়ের ঘাটতি

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প (বিসিক), ঢাকাকে সভাপতি করে রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক ১৬ আগস্ট ২০১১ তারিখে প্রতিবেদন প্রদান এবং কেরানীগঞ্জের সোনাকান্দায় স্থান নির্ধারণের সুপারিশ করা হয়। পরবর্তীতে ১১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সম্ভাব্যতা যাচাই গঠিত কমিটি কর্তৃক কেরানীগঞ্জের ব্রাহ্মণকৃত্তায় পল্লী স্থাপনের সুপারিশ এবং সে অনুযায়ী পুনরায় ডিপিপি প্রণয়ন ও অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। এর পর ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অর্থাৎ রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণ কমিটি সুপারিশ প্রদানের সাত বছর পর একনেক কর্তৃক ২০১.৮১ কোটি টাকা অনুমোদন যার বাস্তবায়নের সময়কাল ছিল জুলাই ২০১৭-জুন ২০২০। প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণের সময় চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কম জনবহুল এলাকায় পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সে অনুযায়ী "বিসিক রাসায়নিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পল্লী, মুন্সীগঞ্জ" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, যা ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়। এর পাশাপাশি, স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে শ্যামপুর ও টঙ্গীতে দু'টি অস্থায়ী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণে আট থেকে নয় বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কমিটি ও সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন সুপারিশের ফলে রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্ধারণে এই দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়। এটা সমস্যাটিকে যথাযথ গুরুত্ব

না দেওয়া ও সমন্বয়হীনতার একটি প্রমাণ। এই বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বয়ের ঘাটতি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর কর্তৃক সহায়তার ঘাটতির বিষয়টি লক্ষণীয়। এছাড়া উল্লেখ্য যে, স্থান নির্বাচনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে পরামর্শ না করে 'কম জনবহুল এলাকা' নির্ধারণের চেষ্টা করতে দেখা যায়। এর ফলে কেরানীগঞ্জের ব্রাহ্মণকৃত্তায় জমি অধিগ্রহণের কাজটি বাধাগ্রস্ত হয়।

টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও দীর্ঘসূত্রতা

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত টাস্কফোর্স কর্তৃক টেকনিক্যাল কমিটির অধীনে তিনটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। প্রথম সাব-কমিটির দায়িত্ব ছিল, উচ্চ মাত্রার দাহ্য পদার্থ (তরল, কঠিন), বিষাক্ত পদার্থ, ক্ষয়কারক পদার্থ, বিপদজনক পদার্থ মজুদ, ব্যবহার, আমদানি ও লাইসেন্স প্রদান প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিধিবিধানের অসংগতি দূর করা এবং উচ্চ মাত্রার দাহ্য পদার্থ সনাক্ত করতঃ তালিকা প্রণয়ন করা। টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে বুয়েটের একজন সহযোগী অধ্যাপককে আহবায়ক করে আট সদস্যের সাব-কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছিল। এই কমিটির আওতাভুক্ত উল্লেখযোগ্য কাজগুলো হলো:

- প্রতিবেদনে সুপারিশসহ বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ চিহ্নিতকরণ
- সাব-কমিটি কর্তৃক চার ধরনের মোট ৮৪৪টি রাসায়নিক সনাক্তকরণ
- রাসায়নিক তৈরির কারখানার লাইসেন্স প্রদানের সময় কারখানায় দক্ষ কেমিস্ট রাখার শর্ত আরোপ করার সুপারিশ

বিগত ২ জুলাই ২০১৪ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ জুলাই ২০১৪ তারিখে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত কমিটি কর্তৃক পুনরায় সুপারিশ প্রণয়ন করে ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরণ করা হয়।

প্রতিবেদনে সাব-কমিটি কর্তৃক বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ চিহ্নিত করে দেওয়া হলেও সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নে সমন্বয়হীনতা ও দীর্ঘসূত্রতার বিষয়টি স্পষ্ট। সুপারিশসমূহ গুরুত্বের সাথে না দেখে দীর্ঘদিন ফেলে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে শিল্প মন্ত্রণালয় মূল সমন্বয়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেও সুপারিশগুলো ত্বরিত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত ফলো-আপের দায়িত্ব পালনে অনীহার বিষয়টি বিভিন্ন দলিলে উঠে এসেছে। এর ফলে সমন্বয়ের ঘাটতি দেখা গিয়েছে।

দ্বিতীয় সাব-কমিটির দায়িত্ব ছিল, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (কর) বিধিমালা, ১৯৮৬ প্রয়োজনে সংশোধনের প্রস্তাব করা এবং টাস্কফোর্স কর্তৃক প্রণীত সুপারিশসমূহ যথাসম্ভব রাসায়নিক ও লাইসেন্স সংক্রান্ত বিধিবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণের সুপারিশ করা। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে নয় সদস্যের সমন্বয়ে বিধি-বিধান অন্তর্ভুক্তকরণ সংক্রান্ত সাব-কমিটি কর্তৃক মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (কর) বিধিমালা, ১৯৮৬-এর ৪৪(৩) ধারায় কতকগুলো বিষয় সংযোজন করার সুপারিশ করা হয়। যেমন:

- রাসায়নিক ও রাসায়নিকযুক্ত দ্রব্যের ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে কারখানা লিমিটেড হলে ইন-কর্পোরেট সার্টিফিকেট, আশেপাশের হোল্ডিং মালিকদের অনাপত্তিপত্র, ফায়ার সার্ভিস ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, বিধিবিধান মেনে চলার ব্যাপারে অঙ্গীকারনামা গ্রহণ
- রাসায়নিক লাইসেন্স প্রদানের জন্য একটি 'ইউনিক অথরিটি' গঠনের প্রস্তাব; জেলা প্রশাসনকে 'ইউনিক অথরিটি' হিসেবে গঠনের প্রস্তাব

সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বয়হীনতার কারণে টাস্কফোর্স প্রদত্ত সুপারিশসমূহ রাসায়নিক ও লাইসেন্স সংক্রান্ত বিধিবিধানে এখনো অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। তবে সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স আবেদনপত্রে ব্যবসার প্রকৃতি উল্লেখ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়কে সভাপতি করে টেকনিক্যাল কমিটি গঠন এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি নির্দেশনা প্রদানের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলেও শিল্প মন্ত্রণালয় সুপারিশগুলোর বাস্তবানের অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত নয়। এবং এই ক্ষেত্রেও শিল্প মন্ত্রণালয় সুপারিশগুলো বাস্তবানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত নয় বলে বিষয়টি এড়িয়ে যায় যা সমন্বয়ের ঘাটতির আরেকটি উদাহরণ। এখনো উল্লেখিত বিধিমালার সংশোধন বা নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় নি। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, রাজউক, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং খোদ জেলা প্রশাসনের দুর্যোগ ও পুর্নবাসন অফিস কর্তৃক 'ইউনিক অথরিটি'র প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হলেও তা গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় নি। তবে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো রাসায়নিক মেজারমেন্ট অ্যাক্ট, ২০২০ মন্ত্রীসভায় অনুমোদন পেয়েছে।

তৃতীয় সাব-কমিটির দায়িত্ব ছিল, রাসায়নিক দ্রব্য গুদামজাত, পাইকারী, খুচরা ও শিল্পে ব্যবহারের জন্য কি পরিমাণ রাসায়নিক সংরক্ষণ করা যাবে তার একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সুপারিশ করা। উপদেষ্টা, এফবিসিসিআই'এর নেতৃত্বে সাত সদস্যের সমন্বয়ে রাসায়নিক সংরক্ষণ কমিটি কর্তৃক রাসায়নিক সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও সুপারিশ প্রদান করা হয়েছিল। সুপারিশগুলো হলোঃ

- রাসায়নিক আমদানিকারী এবং ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক রাসায়নিক সংরক্ষণের জন্য বিদ্যমান বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালন করা
- দুর্ঘটনা মোকাবেলার জন্য রাসায়নিক মজুদাগারের সামনের রাস্তার প্রশস্ততা ৬-৯ মিটার এবং অন্যান্য দিকে ৬ মিটার নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখতে হবে
- উচ্চ চাপবিশিষ্ট বৈদ্যুতিক তার বা খুঁটি থেকে পাঁচ মিটার দূরত্বে রাসায়নিক মজুদাগার স্থাপন করতে হবে
- আবাসিক এলাকা ও ভবন সংলগ্ন বা বহুতল ভবনে দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর মজুদাগার স্থাপন করা হলে ট্রেড লাইসেন্স বা সংরক্ষণ লাইসেন্স প্রদান না করা
- যে সকল কর্তৃপক্ষ রাসায়নিক গুদামজাতকরণের লাইসেন্স প্রদান করে থাকে, লাইসেন্স প্রদানের পূর্বে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা
- শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর গুদাম ও শিল্প কারখানা একই ভবনে হতে পারবে না
- গুদামে ক্ষয়কারক, প্রজ্জলনীয়, দাহ্য ও বিষাক্ত রাসায়নিক একই সাথে রাখা যাবে না
- দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর গুদামে মেকানিক্যাল একজস্ট ফ্যানের (নিষ্কাশন পাখা) ব্যবস্থা থাকতে হবে
- ভবনের বেসমেন্টে দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর সংরক্ষণের অনুমতি দেওয়া যাবে না
- কোনো রাসায়নিক তার ফ্লাস পয়েন্টের চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যাবে না
- প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পরিমাণের চেয়ে বেশি রাসায়নিক রাখা যাবে না
- বিল্ডিং-এর বেসমেন্টে রাসায়নিক সংরক্ষণপূর্বক বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যাবে না
- লোক চলাচলের স্থানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পরিমাণের অধিক রাসায়নিক সংরক্ষণ বা প্রদর্শন করা যাবে না
- আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক মজুদের লাইসেন্স প্রদান করা যাবে না
- অবৈধভাবে রাসায়নিক আমদানি, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে আইনের অধীনে কারণ দর্শানো নোটিশ জারী করে আইনানুগ/বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে
- দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর সংরক্ষণ আইনানুগ প্রক্রিয়া যথাযথভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি তদারকি, প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী বিভাগ ও আমদানীকারক এবং উৎপাদনকারী এসোসিয়েশনের সমন্বয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করতে হবে
- বিদ্যমান বিধি-বিধান অনুযায়ী লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য ক্রমানুসারে ট্রেড লাইসেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের লাইসেন্স, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র, বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আর্মস এয়াক্ট অনুযায়ি নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সংযুক্ত করতে হবে
- লাইসেন্সবিহীন "প্রকৃত ক্ষুদ্র ব্যবহারকারী" যেন ব্যবহারের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্রয় ও সংরক্ষণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করে সুপারিশ করা

এক্ষেত্রেও সমন্বয়হীনতার কারণে রাসায়নিক মজুদের জন্য সরকার নির্ধারিত স্থান প্রস্তুত না হওয়ায় ঝুঁকি নিয়েই আবাসিক এলাকায় চলছে রাসায়নিক মজুদ, বিক্রি ও কারখানায় ব্যবহার চলমান রয়েছে। সুপারিশ অনুসারে গুদামের সামনের রাস্তা ৬-৯ মিটার প্রশস্ত, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে পাঁচ মিটার দূরত্বে অবস্থান, আবাসিক এলাকা ও ভবন বা বহুতল ভবনে রাসায়নিক মজুদের লাইসেন্স না দেওয়ার আদেশ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ার বিষয়টি লক্ষণীয়। আবাসিক এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স/ছাড়পত্র/সংরক্ষণ লাইসেন্স প্রদান বন্ধ থাকলেও নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে লাইসেন্স বের করার অভিযোগ রয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিল্ডিংয়ের বেসমেন্টে রাসায়নিকের সংরক্ষণের অনুমতি দেয়া যাবে না বলা হলেও ওয়াহিদ ম্যানশনের বেসমেন্টে রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণ করা ছিল।

সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জে

নগর উন্নয়ন বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, কমিউনিটি, উন্নয়ন সহযোগী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল, যেখানে শহরের মেয়র মূল ভূমিকা পালন করার জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত।[১৯] ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কাজের পরিধি ও বাস্তবায়নের সুযোগ অনেক বেশি। কিন্তু তার আওতায় কোনো সেবাপ্রদানকারী সংস্থা নেই, ফলে ঢাকা মহানগরীতে সেবাপ্রদানকারী সংস্থাসমূহের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন, গুদাম স্থানান্তরের জন্য জায়গা নির্বাচন, রাস্তার জন্য প্লট মালিক কর্তৃক জায়গা ছেড়ে দেওয়া নিশ্চিত করা ইত্যাদি দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের হওয়ার কারণে সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে অগ্নি-দুর্ঘটনা প্রতিরোধমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বাস্তবায়নে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়তে হয়। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন কর্মকর্তা বলেন, "৫৫টা সেক্টর আছে কাজের পরিধির মধ্যে, কিন্তু তারা নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। তাদের নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব যদি সিটি কর্পোরেশন পেত তাহলে ভাল হতো।" অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষের সমন্বিত উদ্যোগের ঘাটতি কারণে পুরানো ঢাকা সরু রাস্তা ও অলি-গলি অধ্যুষিত এলাকা, ফায়ার হাইড্রেন্ট ও জলাধারের অভাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের বর্ধিত সক্ষমতা কাজে লাগানো দুরূহ হয়ে পড়ে।

লাইসেন্সহীন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনায় সমন্বয়ের ঘাটতি

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লাইসেন্স বিহীন প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্সের আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনার ঘাটতি রয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক লাইসেন্স বিহীন দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর ব্যবসায় সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স দেয়ার এখতিয়ার নেই। আবার এই সকল প্রতিষ্ঠানকে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসা করা, কারখানা ও গুদাম স্থাপনের অনুমতি প্রদানের কর্তৃপক্ষ একাধিক। লাইসেন্স বিহীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্সের আওতায় আনার কোনো সমন্বিত উদ্যোগ বা পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে নেই। এর ফলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের তৈরি অস্থায়ী গুদাম ও স্থায়ী রাসায়নিক পল্লীতে লাইসেন্স বিহীন প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তর করার যাবে না। এই প্রসঙ্গে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের প্রকল্পগুলোতে শুধুমাত্র বৈধ প্রতিষ্ঠানকে স্থানান্তর করা হবে, যাদের লাইসেন্স নেই তারা এর বাহিরে থেকে যাবে। ফলে ঝুঁকি থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।"

আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয়হীনতা

আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়হীনতার আরেকটি উদাহরণ হিসেবে দেখা যায় যে, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত তদন্ত কমিটিতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। রাজউকে ভবনের নকশা অনুমোদনের জন্য ফায়ার সার্ভিস, সিভিল এভিয়েশন, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রয়োজন হয়। বর্তমানে রাজউকের কাজে গতিশীলতা আনার জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) পরিবেশ অধিদপ্তরে ছাড়পত্র ছাড়াই নকশা অনুমোদনের নিয়ম করেছে। এ সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে বলা হয়, "অনেক ভবন হচ্ছে আমাদের ছাড়পত্র ব্যতিরেকে এবং এই বিষয়টি আমরা মাঠে নেমে খুঁজে বের না করলে জানা যায় না যে, কোন ভবন আমাদের ছাড়পত্র নেয় নি।"

শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক শ্যামপুরে অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য নির্মিত গুদামে পরিবেশ অধিদপ্তরের সুপারিশ সত্ত্বেও ইটিপি স্থাপন না করে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অন্যদিকে, টঙ্গীতে অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গৃহীত প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সুপারিশ উপেক্ষা করে এবং পরিবেশ আইন অমান্য করে পুকুর ভরাটের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শ্যামপুরে ইটিপি স্থাপন না করা ও গাজীপুরের অস্থায়ী রাসায়নিক পল্লীর জন্য নির্ধারিত স্থানের একটি পুকুর ভরাট করার প্রসঙ্গ নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণ দেওয়া হলে বিসিআইসি'র একজন কর্মকর্তা পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তাকে বলেন, "আপনি আমাদের কাজে বাধা দিতে এসেছেন।"

টাস্কফোর্সের সুপারিশ অনুযায়ী রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা স্থানান্তরে সমন্বয় ও দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য হচ্ছে, "বরাদ্দকৃত জায়গায় নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদেরই। কিন্তু এখানে যে এখনো ব্যবসা চলছে সেটা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তো বিস্ফোরক অধিদপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, রাজউক, জেলা প্রশাসন এবং পরিবেশ অধিদপ্তরেরও আছে।" বিস্ফোরক অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আইন করেন, পলিসি করেন; কেউ দায়িত্ব নিতে চায় না। কাউকে না কাউকে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থে গুদাম ও কারখানা সরানোর দায়িত্ব নিতে হবে।" তিনি আরো বলেন, "আইনে আমাকে যেমন প্রাধিকার দেওয়া আছে, অভিযান চালানো ও মালামাল জব্দ করা সমান ক্ষমতা পুলিশ ও জেলা প্রশাসনকেও দেয়া আছে।"

[১৯] Pramanik, M.M.A. and Islam M.A. (2013); Problems of Urban Governance of Dhaka City within the context of co-ordination among different agencies; https://www.researchgate.net/publication/317954243

চুড়িহাট্টা অগ্নিকান্ডের পর গঠিত টাস্কফোর্সের কর্মকান্ডে চালাতে সমন্বয়ের অভাব সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে বলা হয়, "কোনো লক্ষ্য নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে অভিযান পরে স্তিমিত হয়ে যায়। এই দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে নতুন কোন ইস্যু আসে আর আমরা পুরাতন জিনিস ভুলে যাই।"

রাজউক কর্তৃক অবৈধ বা অননুমোদিত ভবনের সেবা সংযোগ বন্ধ করে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করা হলে কোন কোন সময় এই সব ভবনের সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় না। আবার অনেক সময় সেবা সংযোগ বন্ধ করে দেয়া হলেও অবৈধভাবে এই সব ভবনে পুনঃসংযোগ দেয়া হয়। এই বিষয়ে সেবা সংযোগ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তদারকির ঘাটতি বিষয়টি রাজউকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। সমন্বয়হীনতার উদাহরণ দিতে গিয়ে রাজউকের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমরা চিঠি দিয়ে অন্য প্রতিষ্ঠানকে সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে বলি। অনেক সময় দেখি আমাদের লিখিত অনুরোধ মানা হয় না। ক্ষেত্র বিশেষে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া সংযোগগুলো পুনরায় দেয়া হয়।"

অন্যদিকে, বর্তমানে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের নিজস্ব উদ্যোগের অংশ হিসেবে দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর তালিকা তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। তবে তথ্য সংগ্রহের সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের ছাড়াই বিস্ফোরক অধিদপ্তর দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর তালিকা তৈরির কাজটি শুরু করেছে।

স্থানীয় থানা কর্তৃক রাজউকে সহযোগিতা না করার অভিযোগ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই অবৈধ নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে রাজউক কর্তৃক কোন কোন সময় স্থানীয় থানার সহযোগিতা না পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। কোন অবৈধ বা অননুমোদিত নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে স্থানীয় থানার সহায়তা চাওয়া হলে স্থানীয় থানা কর্তৃক তাদের কার্যক্রম শুধু পরিদর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে অবৈধ নির্মাণ কাজের বন্ধে কোন পদক্ষেপ না নিয়েই চলে আসে।

কলকারখানা অধিদপ্তরের কাজ পরিদর্শনের ভিত্তিতে প্রতিবেদন দেওয়ার মধ্যেই সীমিত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের অভাবে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে যোগাযোগ করলেও সহায়তা পায় না। কিছু ক্ষেত্রে মালিকের ঠিকানা খুঁজে না পেয়ে নোটিশও দিতে পারে না কারণ শ্রমিকরা মালিকের নাম-ঠিকানা বলতে চান না।

আন্তপ্রতিষ্ঠান যোগাযোগের ঘাটতি

রাসায়নিক কারখানা ও গুদামের লাইসেন্স প্রদানে আন্তপ্রতিষ্ঠান যোগাযোগ বা সমন্বয় না থাকার বিষয়টি লক্ষণীয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "কোনটার পরে কোন লাইসেন্স/ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র নিতে হবে সে ক্ষেত্রে কোনো ক্রম মেনে চলার কথা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে নেই...এটা না থাকার কারণে এই ধাক্কা-ধাক্কি।" সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র না দেখেই লাইসেন্স প্রদানো বিষয়টিও লক্ষণীয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "টাস্কফোর্সের অভিযানের সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র হাতে গোনা ২-১টিতে ছিল।" একই টাস্কফোর্সের অভিযান সম্পর্কে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "অভিযানের সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ট্রেড লাইসেন্স, পরিবেশের ছাড়পত্র, কলকারখানার অধিদপ্তরের লাইসেন্স রয়েছে। কিন্তু বিস্ফোরক অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই।" এ প্রসঙ্গ নিয়ে কলকারখানা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "দেখা যায় ৫ বছর ধরে ফ্যাক্টরি চলছে, তারা ব্যংক ঋণও নিয়েছে, সব সেবা সংযোগ আছে, ট্রেড লাইসেন্স আছে। কিন্তু তাদের কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স নেই।" সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র না দেখেই লাইসেন্স প্রদান করা সম্পর্কে কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "ট্রেড লাইসেন্স করার সময় তারা যদি দেখতো যে নকশার অনুমোদন নেই, লেআউট আর কাঠামোর অনুমোদন নেই, তাহলে তারা নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ট্রেড লাইসেন্স দিতো না, কিন্তু সিটি কর্পোরেশন তো এভাবে ট্রেড লাইসেন্স দেয় না।"

চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পূর্বে এমনকি নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর লাইসেন্স বা পরিদর্শন বিষয়ে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিশেষ করে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় না থাকার বিষয়টি লক্ষণীয়। তবে অতি সাম্প্রতিক সময়ে বিস্ফোরক অধিদপ্তর ও কলকারখানা অধিদপ্তরের মধ্যে প্রয়োজন সাপেক্ষে একে অপরকে আরো সহযোগিতা করার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে।

৩.২.৩ স্বচ্ছতা

ক্ষতিপূরণ প্রদানে স্বচ্ছতার ঘাটতি

নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পরিপূর্ণ ক্ষতিপূরণ বা আর্থিক সহায়তা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয় নি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর কর্তৃক নিমতলী অগ্নিকাণ্ডে নিহতের পরিবারকে এক লক্ষ টাকা এবং আহতদেরকে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি

২০ হাজার টাকা প্রদান করে যা ক্ষয়ক্ষতির তুলনায় তা অতি সামান্য। নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের একজন ভুক্তোভোগী বলেন, "আমার ছেলে মারা যাওয়ার কারণে ১ লক্ষ টাকা পেয়েছিলাম, আমার চিকিৎসার জন্য ২০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছিল। আর স্থানীয় সংসদ সদস্য আমার এক মাসের খাওয়া-দাওয়ার খরচ দিয়েছিল। কিন্তু আমার শরীরের পোড়া অংশ ঠিক করার জন্য প্রাইভেট হাসপাতালে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল, যার খরচ আমাকেই বহন করতে হয়েছিল। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের লাশ সৎকারের জন্য জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ২০ হাজার টাকা দেয়া হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার কোনো ধরনের বা পরিমাণের ক্ষতিপূরণ কেন পেয়েছেন বা পাননি সে সম্পর্কে অবগত নন। এপ্রিল ২০২০ এ শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৭০ জনের মধ্যে ২৮ জন নিহতের পরিবারকে দুই লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। যে সকল নিহতের পরিবার এই অধিদপ্তর থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পায় নি পরবর্তিতে তারা যোগাযোগ করনে। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির বিষয়ে বাকীরা কেন এই ক্ষতিপূরণের টাকা পান নি বা আদৌ পাবেন কি না সে সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট তথ্য জানানো হয় নি।

অন্যদিকে, ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ক্ষয়ক্ষতির শিকার হলেও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে একই পরিমাণ বা ধরনের ক্ষতিপূরণ প্রদান করার উদাহরণ রয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত চারটি পরিবারকে দুই লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত এই চারজনের মধ্যে নিহতের পরিবার, আহত ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এমন ব্যক্তিও রয়েছে। এই ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ পাওয়া ব্যক্তিদের কিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে তা বঞ্চিত ক্ষতিগ্রস্থদের জানানো হয় নি।

এছাড়াও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক যোগ্যতার ভিত্তিতে ২৮টি পরিবারের সদস্যকে দৈনিক মজুরীর চুক্তি ভিত্তিক বর্জ্য বিভাগে চাকুরি দেয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়। যোগ্যতার মাপকাঠির হিসাবে দেখা যায় যে, স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ব্যক্তিকেও এই চাকুরির প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। আবার, বর্জ্য বিভাগে চাকুরির প্রস্তাব দেয়া পরিরাবগুলোর মধ্যে কারো স্বামী বা পরিবারেরে অন্য কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন, কারো পরিবারের কোন সদস্য আহত হয়েছিলেন। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ক্ষতির শিকার হওয়া পরিবারগুলোকে একই ধরণের ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে। এর বিপরীতটি হতেও দেখা যায়, যেমন অগ্নিকাণ্ডে নিহত, আহত অথবা ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যদের সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য বিভাগে চাকুরি অথবা দুই লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে বেছে নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডে নিহতদের স্ত্রীদের বা পরিবারের সদস্যদের বর্জ্য বিভাগে চাকুরির যে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, তা এই ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি চরম অসম্মান এবং অসংবেদনশীলতার বহিঃপ্রকাশ। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে নিহত একজনের স্ত্রী বলেন, "অগ্নিকাণ্ডের পর সিটি কর্পোরেশন থেকে সরকারি চাকুরি অথবা নগদ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দুই লাখ টাকা এই দুইটি থেকে যে কোন একটি বেছে নিতে বলা হয়েছিল। আমি চাকুরি করতে চেয়েছিলাম। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের এক বছরপূর্তির স্মরণ সভায় মেয়র সাহেব একটি খামে করে চাকুরির নিয়োগপত্র দিয়েছিলেন। পরে দেখি দৈনিক চুক্তিভিত্তিক রাস্তায় ময়লা পরিষ্কার করার চাকুরি দেয়া হয়েছে। আমি অন্য চাকুরি চাইলে সিটি কর্পোরেশন থেকে গত ছয় মাসেও কোন সদুত্তর পাই নি। এখন আমার কাছে ক্ষতিপূরণ হিসেবে চাকুরিও নেই, নগদ টাকাও নেই।" উল্লেখিত ঘটনাটি প্রকারান্তরে কোনো ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার উদাহরণ। আবার, কোন কোন ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের প্রস্তাবিত মার্কেট প্রকল্পে দোকানের মালিকানা দেয়ার নামে নিহতদের পরিবারের কাছ থেকে অগ্রীম দুই-তিন লক্ষ টাকা নেয়ার ঘটনাও রয়েছে।

দুর্ঘটনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক এবং সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ হিসাব করার পদ্ধতি কোন আইনে সুনির্দিষ্ট করে বলা নেই। নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে দেওয়া ক্ষতিপূরণ আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল মানের তুলনায় অতি সামান্য। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে ক্ষতিপূরণ গণনা করার প্রতিষ্ঠিত কোন পদক্ষেপের বিষয়ে আইনে কোন কিছু বলা নেই। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উচ্চ আদালতের নির্দেশে ২০১৪ সালে রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় নিহত, নিখোঁজ ব্যক্তিদের স্বজন এবং আহত ব্যক্তিদের ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের লক্ষ্যে সরকারি উচ্চপর্যায়ের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এই কমিটি কর্তৃক প্রত্যেক নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবারকে ২০ লাখ টাকা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়। যেখানে দুঃখ-যন্ত্রণা বাবদ পাঁচ লাখ টাকা দেয়ার সুপারিশ করা হয়, যা আইএলও'র বিধানে না থাকায় পরে বাদ দেয়া হয়। পরবর্তীতে এই কমিটি কর্তৃক ১৪ লাখ ৫১ হাজার ৩০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। এছাড়াও শ্রমিকদের আঘাতের ধরন অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করে দেড় লাখ টাকা থেকে শুরু করে ১৪ লাখ ৫১ হাজার ৩০০ টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়। ভবন মালিক, কারখানা মালিক, বিজিএমইএ, বিদেশি ক্রেতা ও সর্বোপরি সরকারি সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহ করার জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশ করা হয়, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার ছিল আদালতের।[২০] অন্যদিকে, ২০১১ সালের ১৩ আগস্ট বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদ এক সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ

[২০] "ক্ষতিপূরণ চূড়ান্ত, বাগড়া মালিকদের"। *প্রথমআলো। ২৮ জানুয়ারি ২০১৪*

করেন। এর প্রেক্ষিতে দায়ের করা ক্ষতিপূরণ মামলায় ৩ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে উচ্চ আদালত নিহতের পরিবারকে আসামীদের পক্ষ থেকে ৪.৬২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য রায় ঘোষণা করেন।[২১] আদালত কর্তৃক এই ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারীর মৃত্যু, পরিবারের আয় সংকোচিত হয়ে যাওয়া, পরিবার কর্তৃক নিহতের ভালবাসা, স্নেহ, সুরক্ষা ও যত্ন হারানো, নিহতের স্ত্রীর আহত হওয়া এবং তাদের গাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যুক্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ জারি করা হয়। দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বাস চালক, ইনস্যুরেন্স কোম্পানি এবং বাসের তিনজন মালিককে এই ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য আদেশ দেয়া হয়। উচ্চ আদালতের অনুকরণীয় এই রায়গুলোর মতো কোন চর্চা ২০১৯ সালের চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষেত্রে দেখা যায় নি।

তথ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্মুক্ততায় ঘাটতি

লাইসেন্স ছাড়া কতগুলো রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও দোকান পরিচালিত হয় সে হিসাব সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কাছে নেই। যারা নিজ উদ্যোগে লাইসেন্স নেয় কর্তৃপক্ষ শুধু তাদের সম্পর্কে ধারণা রাখে। বিস্ফোরক অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "পুরনো ঢাকায় বিস্ফোরক নয় এমন অনেক ধরনের রাসায়নিক ও দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ আছে, যার নামও আমরা জানি না। এখানে কোন ধরনের কত পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ আছে তা আমাদের জানা নেই।" তিনি আরো বলেন, "পুরনো ঢাকায় কতগুলো বৈধ রাসায়নিক অবাধে আসছে তা জরিপ করে বের করতে হবে।" এই প্রসঙ্গে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের কী কী ঝুঁকি আছে তার জরিপ আমরা কখনো করি নি।" পুরনো ঢাকায় কতগুলো রাসায়নিকের গুদাম ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের কাছে এই সম্পর্কে তথ্য নেই, আর সাম্প্রতিক সময়ে আমরা ছাড়পত্র দেওয়া বন্ধ রেখেছি। এটা সিটি কর্পোরেশন বলতে পারবে। কারণ তারা ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে থাকে। সেখান থেকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।"

স্থানীয় বাসিন্দারা এলাকায় অবস্থিত রাসায়নিকের গুদাম, কারখানা ও দোকানের বৈধতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছে জানতে চাইলেও তথ্য দেওয়া হয় না। একজন তথ্যদাতা বলেন, "কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ কারখানা তা আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? স্থানীয় কাউন্সিলরদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা কোন জবাব দেন না। কেউ সাহস করে থানায় গেলে সেখান থেকেও কিছু জানা যায় না।"

এছাড়াও রাসায়নিক আমদানিতে ট্যাক্স-ভ্যাট ফাঁকি দিতে সঠিক হিসাব উল্লেখ করা হয় না। সংশ্লিষ্ট অসাধু কর্মকর্তাদের যোগসাজসে এসব করা হয়। ফলে কী ধরনে ও পরিমাণের রাসায়নিক আমদানি করা হয় সে সম্পর্কে পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় না। একজন রাসায়নিক ব্যবসায়ী বলেন, "আমদানির সময় ট্যাক্স-ভ্যাট ফাঁকি দেওয়া হয়। যেমন ধরেন দাম তিন কোটি টাকা। সেটা ওখানেই পরিবর্তন করে এক কোটি টাকা বানানো হয়।" আমদানি সংক্রান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৭-১৮ সালে দেশে ১৭ হাজার কোটি টাকার রাসায়নিক আমদানি করেছি। একজন রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ বলেন, "রিপোর্টেড রাসায়নিকগুলো কোথায়, কিভাবে মজুদ সে ব্যাপারে আমাদের কোনো ডাটাবেইজ নেই, বাকী দাহ্য রাসায়নিক পদার্থেরর অবস্থা কি তা সহজেই অনুমেয়!"

৩.২.৪ জবাবদিহিতা

ভবনের ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবহার রোধে তদারকির ঘাটতি

রাজউক গঠনের পূর্বে নির্মিত অনুমোদিত ও অননুমোদিত পুরাতন ভবনের ব্যাপারে রাজউকের দায়িত্ব নেই বলে দাবি করা হয়েছে। আবার অনুমোদিত ভবনের অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নেওয়ার হার কম বলে বাড়ি কী কাজে ব্যবহৃত হয় রাজউক কর্তৃক তা পরিদর্শন না করা হয় না। এর ফলে একই ভবনের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহার হচ্ছে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অংশের বেশিরভাগই দাহ্য পদার্থের গুদাম ও বিভিন্ন পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। রাজউকের একজন কর্মকর্তা বলেন, "বহু পুরাতন ভবন আছে যেগুলো রাজউক অনুমতিই দেয় নাই...ওই ক্ষেত্রে রাজউক কী করবে?... বর্তমান আইনে আছে ভেঙ্গে গুড়ো করে দেওয়া। করি বছরে ১০-১৫টা; কিন্তু, হচ্ছে ১৫০টা।"

[২১] *Dhaka Tribune (ইংরেজী ভাষায়)। ৩ ডিসেম্বর ২০১৭*

ভবনের ঝুঁকি পূর্ণ ব্যবহার রোধে মালিকদের বেপরোয়া মনোভাব

ছবি: গোডাউন ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি বাসার গেটে ঝুলানো

অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ির মালিক ও কারখানার মালিক পরিবারসহ অন্যত্র বসবাস করেন। সুতরাং তাদের কাছে রাসায়নিক গুদাম বা কারখানার জন্য বাড়ি ভাড়া দিলে ঝুঁকি তৈরির বিষয়টি গুরুত্ব পায় না। উর্দু রোডের একজন ভাড়াটিয়া বলেন, "এই বাসার নিচে প্লাস্টিকের দোকান আর গোডাউন থাকায় আমরা এবং অন্যান্য ভাড়াটিয়ারাও অনেক ভয়ে আছি। এই বাসা থেকে বের হওয়ার শুধু একটাই পথ। আর গোডাউন হলো নিচে। গোডাউনে আগুন লাগলে বের হওয়ার আর কোনো পথ থাকবে না। এটাই আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় আতংকের।" নিমতলীর একজন ভাড়াটিয়া বলেন, "এই বাসার নিচে প্লাস্টিকের কারখানা রয়েছে। কারখানাটি মালিকের নয়। এটা মালিক অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। ১০ বছর যাবৎ এখানে প্লাস্টিকের কারখানা রয়েছে। কারখানার শব্দে এখানে থাকা অনেক কষ্টের। শব্দে ঘুমানো যায় না। বাড়িওয়ালাকে বলেও কিছু হয় না। বলে অসুবিধা হলে বাসা ছেড়ে দিয়ে চলে যান।" নিমতলীর আরেকজন ভাড়াটিয়া বলেন, "এই বাসার ২ জন মালিক ছিলেন। যে মালিকের নিচের অংশের মালিকানা ছিল তিনি সেটা কারখানা মালিকের কাছে ভাড়া দিয়ে অন্য জায়গায় বাসা করে চলে গিয়েছে। তাকে বলেও কোন লাভ হয় নি।" আবার কারখানা বা গুদামের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি টাকায় ভাড়া দেওয়া যায়, আবার অগ্রিম অর্থও বেশি নেওয়া যায়। তাই বাড়ির মালিক বসবাসের জন্য না দিয়ে কারখানা বা গুদাম হিসেবে ভাড়া দিতে বেশি আগ্রহী।

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় ঘাটতি

ইমেইল, ফোন ও ডাকযোগে অভিযোগ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকলেও স্থানীয় জনগণের পক্ষ থেকে অবৈধ বা ঝুঁকিপূর্ণ কারখানা বা গুদাম নিয়ে অভিযোগ জানানো হয় না। এক্ষেত্রে অনেক সময় তারা বুঝতে পারে না যে কোন গুদাম বা কারখানা অবৈধ বা অননুমোদিত কি না। আবার অনেক সময় নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ না করার উদাহরণ রয়েছে। জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা বলেন, "কে অভিযোগ করবে? কারখানার মালিকরা উচ্চ পর্যায়ের লোক। মানুষ ভাবে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবো।"

অন্যদিকে, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ৪০টি বেসরকারি ব্যাংক কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তহবিলে ৩০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহ অদ্যাবধি এই তহবিল থেকে কোন টাকা পান নি এবং এই ফান্ডের টাকা কি অবস্থায় আছে তা সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারগুলো অবগত নন। পাশাপাশি রাষ্ট্রের দায়িত্ব উল্লেখ করে তারা ১৫ মে ২০১৯ তারিখে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি করলেও তা এখনো নিষ্পত্তি হয় নি ।

জবাবদিহির ঘাটতি

নিমতলী ট্রাজেডির পর গঠিত তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশের বেশিরভাগ বাস্তবায়িত হয় নি। তদন্ত কমিটি কর্তৃক দেওয়া ১৭টি সুপারিশের মধ্যে আটটি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং নয়টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নে কোনো দিক-নির্দেশনা দেওয়া ছিল না। এর ফলে, যে প্রতিষ্ঠানের আওতায় সুপারিশগুলো পড়ে তাদেরকে বাস্তবায়ন কেন সম্পূর্ণ হয় নি সে সম্পর্কে জবাবদিহির কোনো দৃষ্টান্ত নেই।

অন্যদিকে, টাস্কফোর্সের চারটি সুপারিশের মধ্যে একটি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে এবং তিনটি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় নি। টাস্কফোর্সের অধীনে গঠিত টেকনিক্যাল কমিটির সভাপতি এবং মূল সমন্বয়কারীর ভূমিকা ছিল শিল্প মন্ত্রণালয়ের। শিল্প মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য অংশীজন কর্তৃক সুপারিশ বাস্তবায়ন কেন সম্পূর্ণ হয় নি সে সম্পর্কে জবাবদিহির কোনো দৃষ্টান্ত নেই। অগ্নি-দুর্ঘটনা রোধ ও

নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট দপ্তর তাদের কাজের পরিধি ও সীমাবদ্ধতার অজুহাতে নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই বিষয়ে তাদের জবাবদিহির আওতায় নেওয়ার কোন উদাহরণ নেই।

বিচারহীনতা ও আদালতের আদেশ পালন না করা

নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী অবৈধ গুদাম বা কারখানা ও ভবন মালিকদের বিচারের আওতায় আনা হয় নি। ২০১০ সালে নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর কয়েকটি মানবাধিকার সংস্থা কর্তৃক উচ্চ আদালতে জনস্বার্থে একটি মামলা করা হয়। এবং চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর ২০১৯ সালে চকবাজার থানায় একজন নিহতের সন্তান কর্তৃক ওয়াহিদ ম্যানশন ভবন ও গুদাম মালিকসহ ১২ জনকে দায়ী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। চুড়িহাট্টা আগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী ওয়াহিদ ম্যানশনের মালিকদ্বয় জামিনে মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে জেলের বাহিরে আছেন। নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের জন্য দায়ী অবৈধ গুদাম/কারখানা মালিকদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয় নি। নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের একজন ভিকটিম বলেন, "গুদামের মালিক কি সরকারের থ্যাইকাও শক্তিশালী? আমার পোলার মৃত্যুর লাইগ্যা ক্যাডা দায়ী তার নামডা আইজ পর্যন্ত জানতে পারলাম না। মরার আগেও যদি জানতে পারতাম যে, গোডাউন মালিকের শাস্তি হইসে তাইলে শান্তি পাইতাম।" এ সম্পর্কে পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "এখানে অপরাধ করলে, অপরাধীদের কোনো কিছু হয় না।"

এখানে উল্লেখ্য যে, বেসরকারি পরিবেশবাদী ও মানবাধিকার সংস্থাগুলোর দায়ের করা এক রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট পুরনো ঢাকার রাসায়নিক গুদামগুলো কেন সরিয়ে ফেলা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করলেও দীর্ঘ দশ বছরে সরকার কর্তৃক আদালতে কোনো জবাব দাখিল করা হয় নি, যা আদালত অবমাননার শামিল। এই জন্য সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি করার কোনো উদাহরণ নেই।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মামলা দায়ের হলেও স্থানীয় থানা কর্তৃক আসামীদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে সুস্পষ্ট গাফিলতির উদাহরণ রয়েছে। অনেক সময় স্থানীয় থানা কর্তৃক আসামীদের নাম ও ঠিকানা সঠিক থাকলেও এই ব্যাপারে তথ্য পাওয়া যায়নি বলে প্রতিবেদন পেশ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে মামলা থেকে আসামীদের নাম খারিজের জন্য আবেদন করতে বাধ্য হতে হয়। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "অনেক সময় সঠিক তদন্ত রিপোর্ট দিলে অভিযুক্তরা সরকারের উচ্চ মহলে চলে যায়। তখন বাধ্য হয়ে তাদের নাম বাতিল করতে হয়। এক্ষেত্রে নাম বাদ না দিলে আমার চেয়ারের সমস্যা, আর বাদ দিলে পুরো ডিপার্টমেন্ট আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকে।" তিনি আরও বলেন, "আমরা অনেক জাল ছাড়পত্র পাই। আমাদের নথির সাথে মেলালে সেগুলোর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। ...জাল ছাড়পত্র পাওয়া গেলে একটি ব্যাটারি কারখানার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ৭০,০০০ টাকা খরচ করে দোকানের বাজেয়াপ্ত সিসার বার পরিবেশ অধিদপ্তরে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু পনের দিনের মাথায় কারখানার মালিক আদালত থেকে জামিন নিয়ে পণ্য ফেরত নিয়ে যায়।"

৩.২.৫ অংশগ্রহণ

পরিকল্পনা গ্রহণ এবং সুপারিশ বাস্তবায়নে জনসম্পৃক্ততার ঘাটতি

পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক ব্যবসা, গুদাম ও কারখানা সরাতে ব্যবসায়ীদের ব্যাপক অনীহা রয়েছে। তাদের ধারণা অন্য জায়গায় ব্যবসা সুবিধাজনক হবে না। একজন রাসায়নিক দোকানের মালিকের মতে, "এখন পুরনো টাউন থেকে কোথায় যাব? যুগ যুগ থেকে এই সব বিজনেস এখানে চলে আসতেছে।" একজন রাসায়নিক ব্যবসায়ীর মতে, "অন্য জায়গায় সব ব্যবসা একসাথে পাওয়া যাবে না। তখন আমাদের লস খেতে হবে। দরকার হলে বাসাবাড়ি ওই পাড়ে নিয়ে যাক। কিন্তু ব্যবসা এখানে থাকুক।" দাহ্য পদার্থের গুদাম, কারখানা ও দোকান সরানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মালিক-কর্মচারী ও মহল্লার নেতাদের মিছিল-সমাবেশ করার উদাহরণও রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরে একজন কর্মকর্তা বলেন, "টাস্কফোর্স তাদের কাজ ঠিক মতো করতে পারে নাই। আমরা একটি কম্পাউন্ডে ৪-৫টি কারখানা পেয়েছিলাম। এই কারখানাগুলো পরিদর্শনের সময় মালিকদের উসকানিতে কারখানার শ্রমিকরা আমাদের বাহির থেকে তালা বদ্ধ করে দেয়।" উর্দু রোডের একজন বাড়িওয়ালা বলেন, "এলাকার বেশির ভাগ বাসায় প্লাস্টিক দানার দোকান। যেকোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমি মানুষকে বলি কেউ কথা শুনে না।"

স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ এবং জনপ্রতিনিধিরাও কারখানা ও গুদামের মালিক বা এসব ব্যবসার সাথে জড়িত। এর পাশাপাশি কিছু বাড়ির মালিক, ব্যবসায়িক সমিতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একাংশসহ অন্যান্যরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই ব্যবসার উপকারভোগী, ফলে ব্যবসা স্থানান্তরে তাদের মধ্যে অনীহা রয়েছে। নিমতলীর একজন বাড়ীর মালিক বলেন, "এখানকার পঞ্চায়েত, ব্যবসায়ী, তাদের সংগঠন রাজনৈতিক নেতারা মিলে একটা সিন্ডিকেট। তারা এই সব ব্যবসায় জড়িত এবং তারা একজন আরেকজনকে শেলটার দেয়।"

স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে আলোচনা না করেই জনবহুল কেরানীগঞ্জ এলাকায় রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। ফলে জমি অধিগ্রহণের সময় বাধার সম্মুখীন হয়ে রাসায়নিক পল্লী স্থাপনের সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। কারখানা ও গুদাম স্থানান্তরে দীর্ঘসূত্রতার পেছনে এটাও একটি কারণ।

ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে জনঅংশগ্রহণের ঘাটতি

সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করা হলেও অধিকাংশ বাড়ি, মার্কেট, দোকান ও গুদামে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা অনুপস্থিতির বিষয়টি আমাদের পর্যবেক্ষণে এসেছে। আবার অগ্নি প্রতিরোধে মার্কেট ও দোকানসমূহে বালি, পানি ও ফায়ার এস্টিংগুইসার রাখার পরামর্শ প্রদান করা হলেও অনেক সময় তা রাখা হয় না বা সেগুলো রাখার জন্য জায়গার অপ্রতুলতা রয়েছে। এছাড়াও, অনেক ক্ষেত্রেই বাড়ির মালিক ও কারখানার মালিক পরিবারসহ অন্যত্র বসবাস করার কারণে রাসায়নিক গুদাম বা কারখানার কারণে ঝুঁকি তৈরির বিষয়টি তাদের কাছে গুরুত্ব পায় না। আবার, কারখানা বা গুদামের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি টাকায় ভাড়া দেওয়া এবং বেশি অগ্রিম অর্থের সুযোগের কারণে বাড়ির মালিক বসবাসের জন্য না দিয়ে কারখানা বা গুদাম হিসেবে ভাড়া দিতে বেশি আগ্রহী হন।

৩.২.৬ অনিয়ম ও দুর্নীতি

ট্রেড লাইসেন্সসহ কারখানা ও রাসায়নিক গুদাম স্থাপনের জন্য প্রযোজ্য লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন বন্ধ থাকলেও অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগসাজসে এবং রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগিয়ে লাইসেন্স বের করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পরিবেশ অধিদপ্তরে একজন কর্মকর্তা বলেন, "কোনো প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র না-মঞ্জুর করার কিছু দিন পরই তার হাতে ছাড়পত্র চলে যায়। এটা কীভাবে হচ্ছে তার প্রাতিষ্ঠানিক বক্তব্য আমার পক্ষে দেওয়া সমাচীন নয়।" কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশনের অসাধু কর্মকর্তাদের পরামর্শে ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে রাসায়নিক শব্দটি বাদ দিয়ে এন্টারপ্রাইজ হিসেবে ট্রেড লাইসেন্স বের করে নিচ্ছে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাইসেন্স বের করা কঠিন হয়ে পড়লে রাজনৈতিক নেতাদের প্রভাব ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক ব্যবসার সাথে যুক্ত না হয়েও কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতা নিজেদের নামে লাইসেন্স করে তা ব্যবসায়ীদের প্রদান করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, এসিডের লাইসেন্স বের করা কঠিন বলে এসিড আমদানিতে রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহারের বিষয়টি বেশি দেখা যায়।

দাহ্য পদার্থ পরিবহন করে গুদাম পর্যন্ত নেওয়া হয় অনেকটা প্রকাশ্যেই। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চেক করে অর্থের বিনিময়ে ছেড়ে দেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এজন্য টহল পুলিশ বা চেকপোষ্টগুলো গাড়িপ্রতি তিনশ টাকা করে চাঁদা নেয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে একজন রাসায়নিকের ব্যবসায়ী বলেন, " ঐ দ্যাখেন পুলিশ বসে আছে। যত গাড়ি যাবে মাল নিয়ে সব গুলার থেকে ১০/২০/১০০/২০০ টাকা করে নেয়।" আরেকজন রাসায়নিক কারাখানা ও গুদাম মালিক বলেন, "ব্যবসায়ী সংগঠন প্রতি মাসে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থাকে ২-৩ লক্ষ টাকা করে ঘুষ দিয়ে থাকে।"

সারণী ৬: নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থের পরিমাণ (টাকা)
পরিবেশ অধিদপ্তর	২০,০০০-৩০,০০০
বিস্ফোরক অধিদপ্তর	১,৫০,০০০-২,৫০,০০০
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর	৩,০০০-১২,০০০
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	১,৫০০-১৮,০০০

সুপারিশ বাস্তবায়নে নিয়ম অনুসরণে ঘাটতি

চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর গঠিত টাস্কফোর্স ১০০টির অধিক প্লাস্টিক ও জুতার কারখানা বন্ধ করে দেয়। সেগুলোর মধ্যে অল্প কয়েকটিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছিল। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন প্রদত্ত ট্রেড লাইসেন্স ছিল। এ প্রসঙ্গে

পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "টাস্কফোর্সের অভিযানের সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে। কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র হাতে গোনা ২-১টিতে ছিল।" একই টাস্কফোর্সের অভিযান সম্পর্কে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "অভিযানের সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে, বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানে ট্রেড লাইসেন্স, পরিবেশের ছাড়পত্র, কলকারখানার অধিদপ্তরের লাইসেন্স রয়েছে। কিন্তু বিস্ফোরক অধিদপ্তরের ছাড়পত্র নেই।" লাইসেন্স বিহীন ও অবৈধ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতির প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এই প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিতকরণ ও তা বন্ধ করে দেয়ার প্রক্রিয়া কোনো ঘোষণা ছাড়াই স্থগিত করা হয়।

চুড়িহাট্টায় আগুন লাগার পর গঠিত টাস্কফোর্স কর্তৃক গুদাম/কারখানা চিহ্নিত করে বন্ধ করে দিতে চাইলে ব্যবসায়ীরা প্রধানমন্ত্রী ও মেয়রের নিকট অভিযোগ করে। তাদের অভিযোগ ছিল যে, টাস্কফোর্সের কর্মকর্তারা এসেই জরিমানা করে, গণহারে গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়, সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং দুর্ব্যবহার করে, কথা বলার সুযোগ দেয় না। তাদের এই অভিযোগের পর প্রধানমন্ত্রীর একজন উপদেষ্টা, এফবিসিসিআই-এর প্রেসিডেন্ট, এলাকার কাউন্সিলর, ব্যবসায়ী সমিতি, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, রাজউক চেয়ারম্যান, ঢাকা জেলা প্রশাসক, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিদর্শকের উপস্থিতিতে আলোচনা সভা হয়। সেখানে ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো বলে যে, "ঐতিহাসিকভাবে এবং বংশপরম্পরায় এখানে এই ব্যবসাগুলো চলছে। এখান থেকে ব্যবসা করতে না পারলে আমাদের চলে যাওয়ার জায়গা দেন।" সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে তাদের স্থানান্তর করা হবে। পরবর্তীতে এই টাস্কফোর্সের কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে পড়ে।

রাসায়নিক গুদাম বা কারখানায় মাঝে মধ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক তল্লাশি চলে। ব্যবসায়ীদের মতে, মালামাল বাইরে থাকলে পুলিশ তাদেরকে হয়রানি ও নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের জন্য এসব করে। নিমতলীর একজন কারখানা শ্রমিক বলেন বলেন, "হঠাৎ হঠাৎ এখানে পুলিশ আসে, আমরা পুলিশকে টাকা দেই, তারা চলে যায়। আমাদের কারখানা চলতে থাকে।" নিমতলীর একজন বাসিন্দার ভাষ্যমতে, "চুড়িহাট্টায় আগুন লাগার পর নিমতলী এলাকায় কয়েকবার পুলিশ টহল দিতে এসেছিল; যখন পুলিশ আসে কারখানার মালিক টের পেয়ে কিছুদিন কারখানা বন্ধ রাখে। অনেক সময় পুলিশকে টাকা দেয়। আবার কিছুদিন পর একই অবস্থা শুরু হয়।" এছাড়া একজন রাসায়নিক কারাখানা ও গুদাম মালিক উল্লেখ করেন, "ব্যবসায়ী সংগঠন প্রতি মাসে পুলিশকে ২-৩ লক্ষ টাকা করে ঘুষ দিয়ে থাকে।" এই নিয়ম বহির্ভূত অর্থ প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ীরাও লাভবান হন, কারণ এর মাধ্যমে তারা তাদের নিয়ম ভঙ্গ করে ব্যবসা অব্যাহত রাখতে পারেন।

শিল্প-কারখানায় বিদ্যুতের লোড অনুযায়ী অনুমোদিত কোম্পানী/ঠিকাদার দিয়ে ওয়্যারিং করানো এবং বিদ্যুৎ বিভাগের প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক বা বৈদ্যুতিক উপদেষ্টার কাছে থেকে ছাড়পত্র নেওয়ার নিয়ম রয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে আবাসিক ভবনে স্থাপিত শিল্প-কারখানার ওয়্যারিং চেক না করেই ছাড়পত্র দিয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার আবাসিক ভবনে অবৈধভাবে কারখানা স্থাপন এবং সেখানে বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের বিষয়টিকে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এড়িয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

টেকনিক্যাল কমিটি গুদামের সামনের রাস্তা ৬-৯ মিটার প্রশস্ত হওয়া, বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে পাঁচ মিটার দূরে গুদামের অবস্থান নিশ্চিত করা, আবাসিক এলাকা ও ভবন বা বহুতল ভবনে রাসায়নিক মজুদের লাইসেন্স না দেওয়ার আদেশ প্রদানের সুপারিশ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হয় নি। কমিটির প্রতিটি সুপারিশকে অবজ্ঞা করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়ম ভঙ্গ করে গুদাম ও কারখানার কার্যক্রম পরিচালনা ও স্থাপন অব্যাহত রয়েছে।

রাজনৈতিক প্রভাব

কলকারখানা অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ভাষ্য মতে তারা অভিযান পরিচালনা করতে গেলেই নানা ধরনের বাধার সম্মুখীন হন। বাধা প্রদানকারীরা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এবং অভিযানে গেলেই তারা সরকারের উচ্চ পর্যায়েও যোগাযোগ করে। কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "কলকারখানা মালিকদের সাথে আমরা পেরে উঠি না কারণ পলিটিক্যাল বিষয় আছে।" তিনি আরও বলেন, "জনপ্রতিনিধদের সামনে এই কারখানাগুলো হচ্ছে। তারা কিছু করে না। কারণ এখানে রাজনৈতিক ইস্যু আছে, ভোটের ইস্যু আছে।" তার ভাষ্যমতে, "এই সব ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে কারখানা শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য বিনিয়োগ করাকে লস হিসেবে মনে করা হয়।" স্থানীয় রাজনীতির প্রভাব সম্পর্কে রাজউকের কর্মকর্তা বলেন, "রাজউক তার দায়িত্ব এড়াতে চাচ্ছে না, আমাদেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমরা দেখতে পারি না ঠিক আছে, তাহলে আবাসিক এলাকায় চকবাজার থানার সামনে কীভাবে দিনে বেলা ট্রাক থেকে মালপত্র লোড-আনলোড হয়। এখানে কি পুলিশের দায়িত্ব নেই, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দায়িত্ব নেই? এটা দূর করার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।"

এই প্রসঙ্গে বিস্ফোরক অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "ব্যবসা উৎখাতে অনেক সমস্যা আছে। কারণ এখানে অনেক শ্রমিক নিয়োজিত। আবার রাজনৈতিক বিষয়টিও মাথায় রাখতে হয়।" পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমরা এখানে একক ভাবে কাজ করব সেই অবস্থাও এখানে নাই। অভিযান চালাতে গেলেই বাধা আসে। বাধা প্রদানকারীরা সরকারের উচ্চ পর্যায়ে চলে যায়।" জেলা ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকর্তা বলেন, "সরকারি যে নির্দেশনা রয়েছে তার শতভাগ প্রতিপালন করা হয় নি। কারণ এই কলকারখানগুলোর মালিকানা বিভিন্ন দলীয় লোকের।" তিনি আরো বলেন, "আমরা ঝুকিপুর্ণ গুদাম/কারখানা খুঁজে বের করি। দেখা যায়, মালিক তখন বলে আমি ওমুক এসপি সাহেবের ভাই, আমি প্রধানমন্ত্রীর ওমুক উপদেষ্টার ভাগ্নে। তখন আপনি এখান থেকে ভয়ে সরে আসবেন। কারণ আপনি তার সাথে বাড়াবাড়ি করলে ঢাকায় থাকতে পারবেন না।" তিনি আরও বলেন, "আমার অনেক আইন আছে, আমি প্রয়োগ করতে পারি না। কারণ সমস্যা আছে, আইন প্রয়োগ করলেই আমি এই চেয়ারে থাকতে পারবো না।"

অনেক মার্কেটের মালিক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী হওয়ায় তাদের মার্কেটে থাকা রাসায়নিক গুদাম সরাতে কোনো কর্তৃপক্ষই সাহস পায় না। একজন রাসায়নিক ব্যবসায়ী বলেন, "সরকার যত ক্ষমতা দেখাতে পারে তা শুধু আমাদের মতো ছোট ব্যবসায়ীদের সাথে! এখানে রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের অনেকের গুদাম ও কারখানা আছে। তাদের কারখানা বা মার্কেটে তো কোন দিন অভিযান চালায় নাই!" একজন প্রিন্টিং প্রেসের মালিকের ভাষ্যমতে, "পুরো চকবাজার সিন্ডিকেটের অধীনে আছে। তাই এখানে মোবাইল কোর্ট আসলে তারা এমপি'র শেল্টার পায়। আগুন লাগার ব্যাপারে এখানে কেউ কথা বলতে চাইবে না। কারণ রাজনৈতিক বিপদ আছে।"

এমন কি সরকারের মন্ত্রী পর্যায় থেকে আগুন লাগার বিষয়টি সরকার বিরোধী পক্ষের নাশকতামূলক কার্যক্রম হিসেবে অভিহিত করে মূল সমস্যাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।[২২] পাশাপাশি পূর্ণাঙ্গ কোনো তদন্ত ছাড়াই চুড়িহাট্টার অগ্নিকাণ্ডটি রাসায়নিক নয় বরং গ্যাস সিলিন্ডারের কারণে সংগঠিত হয়েছে বলে সরকারের আরেকজন মন্ত্রী দাবি করেন।[২৩] যদিও পরবর্তীতে এই মন্ত্রীর অধীনস্থ মন্ত্রণালয়সহ ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত তদন্ত প্রতিবেদনে সিলিন্ডার নয় অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতার জন্য রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতিকে দায়ী করা হয়।[২৪][২৫]

এছাড়াও, যার এই ব্যবসার সুবিধাভোগী হিসাবে রয়েছেন কিছু কিছু বাড়ির মালিক, ব্যবসায়িক সমিতি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একাংশ এবং অনেক বড় বড় কোম্পানি যারা পুরনো ঢাকা থেকে প্লাস্টিক পণ্য, কাঁচামাল ইত্যাদি নিয়ে ব্যবসা করেন। তাদের পক্ষ থেকেও স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়ার অভিযোগ আছে।

প্রাতিষ্ঠানিক দীর্ঘসূত্রতা

পুরনো ঢাকার একই ভবনের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহার হচ্ছে এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অংশের বেশিরভাগই দাহ্য পদার্থের গুদাম ও বিভিন্ন পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। রাজউকের একজন কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের দালান ভেঙ্গে ফেলার ক্ষমতা দেওয়া আছে। কিন্তু এর জন্য উপর থেকে 'যথাযথ' নির্দেশ আসতে হবে। কারণ সমস্যাটা পুরো ঢাকা শহরের।" তিনি আরো বলেন, "অনেক ক্ষেত্রেই আমরা অনুমোদন সঠিকভাবে দিয়ে থাকি, কিন্তু দালান সঠিকভাবে করা হয় না। তাত্ত্বিকভাবে এখানে আমাদের দায়িত্ব, কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন... ঢাকা শহরে যারা বাড়ি করে তারা আমজনতা না।"

[২২] "বিএনপি নাশকতা করেছে কি না, খতিয়ে দেখা প্রয়োজন: তথ্যমন্ত্রী"। *প্রথমআলো। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯*

[২৩] "ওয়াহেদ ম্যানসনে কোনো রাসায়নিক গুদাম নেই: শিল্পমন্ত্রী"। *প্রথমআলো। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯*

[২৪] "অবশেষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের তদন্ত, আগুনের শুরু কেমিক্যালে"। *কালের কণ্ঠ। ৫ মার্চ ২০১৯*

[২৫] "রাসায়নিক থেকেই চুড়িহাট্টার আগুন"। *প্রথমআলো। ১৪ মার্চ ২০১৯*

চতুর্থ অধ্যায়: উপসংহার

৪.১ উপসংহার

এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা যায় যে, চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি এবং নিমতলী ট্র্যাজেডিকে ভুলে যাওয়া অর্থাৎ গুরুত্ব না দেওয়ার ফসল। কারণ নিমতলীর ঘটনা থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে ক্ষেত্র বিশেষে আইনি ও প্রয়োগিক সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক চাপ, দুর্নীতি মতো বিষয়গুলোর উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সবগুলো নির্দেশকের ক্ষেত্রেই সুশাসনের ঘাটতি ছিল, যার কারণে পুরনো ঢাকায় নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। এক কথায় সুশাসনের ঘাটতির ফলাফল হচ্ছে চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড।

২০১০ সালে ঘটে যাওয়া নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের কথা ফলাও করে প্রচার করলেও বাস্তবে তার তেমন প্রতিফলন ঘটেনি। গত দশ বছরে ২০১০ সালে গঠিত তদন্ত কমিটি প্রদত্ত ১৭টি সুপারিশের মধ্যে আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে আটটি। আর, কোনো ধরনের বাস্তবায়নের মুখ দেখে নি নয়টি সুপারিশ। অন্যদিকে, টাস্কফোর্সের চারটি সুপারিশের মধ্যে একটি আংশিক বাস্তবায়িত হয়েছে, তিনটি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয় নি। সুপারিশ বাস্তবায়নের এ চিত্রই বলে দেয় পুরনো ঢাকার অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহরে উদাসীনতা প্রকটভাবে বিদ্যমান। নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের প্রায় নয় বছর পর ২০১৯ সালে ঘটে যাওয়া চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড এ উদাসীনতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। এছাড়াও, সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে পুরনো ঢাকার অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের মুখ দেখতে পায় নি। আবার, উচ্চ আদালত কর্তৃক পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিকের গুদাম স্থানান্তরের জন্য কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান এবং অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে দশ বছরেও সরকার কর্তৃক কোনো জবাব দাখিল না করা আদালতের অবমাননার শামিল। ফলে, সরকার ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজেদের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা প্রতিপালন করছে না এবং একইসাথে আদালতের অবমাননা করছে।

নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস বাস্তবের মুখ দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পূর্বে, রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে রাজনৈতিক স্বদিচ্ছার ঘাটতির কারণে স্থানান্তর প্রক্রিয়া প্রকৃত অর্থে শুরুই হয় নি। বরং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক চাপের কারণেও অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। অবৈধ গুদাম বা কারখানার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে তারা প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, জনপ্রতিনিধি, বাড়ির মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়িক সমিতির বাধার সম্মুখীন হয়েছে। আবার অনেক ব্যবসায়ীও স্থানীয় রাজনীতির সাথে জড়িত এবং কেউ কেউ স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের ছত্রছায়ায় থাকেন। স্থানীয় রাজনৈতিক চাপ ও ভোট ব্যাংকের হিসাব-নিকাশ স্থানান্তর প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বাধাগ্রস্থ করেছে। উপরন্তু রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি, বাড়ির মালিক, ব্যবসায়ী ও ব্যবসায়িক সমিতি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ কতিপয় প্রভাবশালী গ্রুপের অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে রাসায়নিক ও দাহ্য পদার্থের গুদাম/কারখানা/ব্যবসা চলমান রয়েছে।

এটাও স্পষ্ট যে, অগ্নিকাণ্ডের ভয়াবহতা প্রকাণ্ড হলেও এ জাতীয় দুর্ঘটনা দুর্যোগ হিসেবে যথাযথ স্বীকৃতি পায় নি। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে যথাযথ বাজেট ও পরিকল্পনা না থাকা তাই প্রমাণ করে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় বাজেট, জনবল ও আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয় না। কেবলমাত্র কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটলে প্রতিষ্ঠানগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার কিছু দিন পর সবকিছু স্থিমিত হয়ে পড়ে।

রাষ্ট্র কর্তৃক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ন্যায্যতার ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া একটি চর্চায় পরিণত হয়েছে। কারণ আইনি বাধ্যবাধকতা না থাকায় দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার বিষয়টিকে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রায়শ অগ্রাহ্য করা হয়। ফলাফলস্বরূপ ক্ষতিপূরণের জন্য কোনো নীতিমালা এখন পর্যন্ত তৈরি করা হয় নি।

এটা লক্ষণীয় যে, নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পরপরই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুদিন সক্রিয় থাকলেও সমন্বয়ের অভাবে তাদের কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে যায়। সমন্বয়ের এ অভাবটি ঘনীভূত হয়েছে দায়িত্ব এড়িয়ে চলার প্রবণতা থেকে। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্পষ্ট করে বলেছে তাদের দায়িত্ব কতটুকু এবং তাদের পক্ষ থেকে তারা কতটুকু চেষ্টা করেছে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে কতখানি সহায়তা

পেয়েছে। নিজ উদ্যোগে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়া - এই দুই ক্ষেত্রেই উদ্যোগের ঘাটতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। অপরদিকে সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘ বিরতিতে সভা আহ্বান এবং দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়ার মধ্যেই তাদের কাজ সীমিত রাখায় সমন্বয় ফলপ্রসূ হয় নি। এর ফলে সুপারিশ বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি তৈরি হয়েছে। পরবর্তীতে চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ড ঘটলে প্রতিষ্ঠানগুলো কিছুটা সক্রিয় হয়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। কিছু ক্ষেত্রে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা ও রাসায়নিক পল্লীর জন্য স্থান নির্বাচনের চেষ্টা করে সময় ও অর্থের অপচয় করা হয়েছে। স্থান নির্বাচন না করায় রাসায়নিক পল্লী স্থাপন করা সম্ভব হয় নি। ফলে, পুরনো ঢাকার আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা স্থানান্তর করাও সম্ভব হয় নি। চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পর পুরনো ঢাকার আবাসিক এলাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা স্থানান্তর করার বিষয়টি পুনরায় আলোচনায় আসলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নতুন করে বোধোদয় হয়। তারা আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে দীর্ঘ দশ বছর পর এ বিষয়টি আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে।

এছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাদের ওপর ন্যস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালনে সদিচ্ছার ঘাটতি ব্যাপক ভাবে লক্ষণীয়। মূলত তাদের কৌশলগত পরিকল্পনার অভাবে এ বিষয়টি তৈরি হয়েছে। ফলে পুরনো ঢাকা থেকে অবৈধ রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা সরিয়ে নিতে ব্যাপক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। অন্যদিকে, গুদাম ও কারখানা মালিক, ব্যবসায়ী ও শ্রমিকদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের সম্মতি আদায় করার প্রচেষ্টাও যথেষ্ট ছিল না। পরিশেষে এটাও স্পষ্ট হয়েছে যে, অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে পুরনো ঢাকায় রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখা হয়েছে। কারণ রাসায়নিক পণ্য পরিবহন, গুদামজাতকরণ, বিক্রি ও কারখানা প্রতিষ্ঠায় লাইসেন্স প্রদানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের দুর্নীতি ও অনিয়ম ব্যাপকভাবে লক্ষ করা গিয়েছে। এমনকি নিমতলী অগ্নিকাণ্ডের পর পুরনো ঢাকায় রাসায়নিক কারখানা, গুদাম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও এখনো অবৈধ পন্থায় লাইসেন্স প্রদান বা নবায়ন অব্যাহত রয়েছে। ফলে পুরনো ঢাকায় রাসায়নিক কারখানা, গুদাম বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সক্রিয়ভাবে অব্যাহত রয়েছে। অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে অংশগ্রহণমূলক ও সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ না থাকলে নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী।

৪.২ সুপারিশ

পুরনো ঢাকার অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে টিআইবি'র পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশ সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্রিয় বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করা হলো:

১. যেকোনো দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নিমতলী ও চুড়িহাট্টা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এবং তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে

২. সরকারের সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে রাসায়নিক বিপর্যয় রোধে জাতীয়ভাবে একটি রাসায়নিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন এবং রাসায়নিক নিরাপত্তা বিষয়ে নির্দেশিকা তৈরি ও নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে

৩. এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি সম্পর্কে বোঝাতে হবে এবং পুরনো ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম, কারখানা ও ব্যবসা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে

৪. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সরাসরি তদারকির মাধ্যমে রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম সরকার নির্ধারিত স্থানে স্থানান্তর নিশ্চিত করতে হবে

৫. ঝুঁকিপূর্ণ ও অবৈধ কারখানা চিহ্নিত করে সেগুলো বন্ধ করতে হবে অথবা অন্তবর্তীকালীন পদক্ষেপ হিসেবে স্বল্পমেয়াদী সময় দিয়ে স্থানান্তরের ব্যবস্থা করতে হবে। স্থানান্তরে রাজি না হলে এসব কারখানার সব ইউলিটি বন্ধ করতে হবে

৬. তদন্ত কমিটি ও টাস্কফোর্সের সুপারিশ বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতার জন্য এবং আদালত অবমাননাকারী দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে

৭. পুরনো ঢাকার অগ্নি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করতে হবে। ভবনগুলোতে নিজস্ব অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি বহির্গমন ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে। পর্যাপ্ত সংখ্যক ফায়ার হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে

৮. রাসায়নিক গুদাম ও কারখানা প্রতিষ্ঠার লাইসেন্স প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলক ও স্বচ্ছ করতে হবে

৯. আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজউক, কলকারখানা ও পরিদর্শন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা আইনে নিশ্চিত করতে হবে

১০. পুরনো ঢাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি নিরসনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ইউনিট তৈরি করতে হবে

সহায়ক তথ্যসূত্র

সহায়ক তথ্যসূত্র

১. Fire Hazards in Dhaka City: An Exploratory Study on Mitigation Measures; Md. Zahirul Islam, Professor Dr. Khondokar Mokaddem Hossain; http://www.iosrjournals.org/iosr-jestft/papers/Vol12-%20Issue%205/Version-1/G1205014656.pdf

২. Dhaka Metropolitan Development Plan (1995-2015): structure plan, master plan and detailed area plan for Dhaka City, DMDP Project, RAJUK (Ministry of Housing and Public Works)

৩. Dhaka Metropolitan Development Plan Strategic Environmental Assessment, The World Bank, Washington DC

৪. http://203.112.218.65:8008/WebTestApplication/userfiles/Image/PopCen2011/Com_Dhaka.pdf

৫. http://www.demographia.com/db-worldua.pdf

৬. Theatrical Sources of for a Theory of Safety and Security, Ludek Lukas, Department of Security Engineering, Tomas Bata University in Ziln, Ziln, Czech Republic.

৭. Ministry of the Solicitor General, Toronto, Canada http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/english/FireMarshal/FireServiceResources/PublicFireSafetyGuidelines/01-01-01.html

৮. Problems of Urban Governance of Dhaka City within the context of coordination among different agencies; M.M.A. Pramanik and M.A. Islam (2013)